রঙ নিয়ে খেলা

শক্তিপদ রাজগুরু

নতুন প্রকাশক
১৩/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট · কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯

প্রকাশিকা
এ. দত্ত
২৪সি রামকমল সেন লেন
কলকাতা-৭

মুদ্রক
নির্মলকৃষ্ণ পাল
নির্মল মুদ্রণ
৮ ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ
সুভাষ সিংহরায়

তিন টাকা

দেবকুমার বসুকে

RANG NIYE KHELA

A Bengali Novel by

Sakti Pada Rajguru

Price Rupees 3'00 only

সারা চাকলার লোক চেনে জগনকে, এক ডাকে চেনে। সে চেনার মধ্যে আছে কিছু আতঙ্ক, ঘৃণা আর কৌতূহল মেশানো একটা অনুভূতি। তার কাছে ঘেঁসতে কেমন ভয় পায় অনেকে, কি যেন চরম ক্ষতি আর ক্ষয় হয়ে যাবে তাদের।

তাই নিকট তার বন্ধুত্ব দুচার জন বিশেষ শ্রেণীর জীব ছাড়া স্বীকার করবার সৎসাহস কারো নেই, অপর সকলেও চেনে ভাল করে দূর থেকেই। রাস্তায় ঘাটে-হাটে দেখা হলে কথা না বলে পারা যায় না, নেহাৎ গাঁয়ের বাসিন্দা আপ্তবন্ধুর পর্য্যায়ে পড়ে সবাই তাই কথা বলে—ছোঁড়াছুড়ি দু একটা আলগা কথা আবার ফারাক হয়ে যায়। অনেকে আবার দূর থেকে ওকে দেখেই সরে যায় আড়ালে। এড়িয়ে যায়। তাতে অবশ্য জগনের কিছু আসে যায় না। বেপরোয়া সে। আড়ালে লোককে বলতে শুনেছে—জগন্নাথ! উরে বাব্বাঃ। সেকালের জগন্নাথ ছিল নুটো জগন্নাথ। ই জগন্নাথের দুহাতই মোক্ষম চলে বাবা। ঈশ্বরদাসের ব্যাটা ই জগন্নাথ। সচ চলেনা যিখানে ঈশ্বরদাস সিখানে ফাল চালায়।

ঈশ্বরদাসের ব্যাটা, এই তার পরিচয়। সারা মহকুমা কেন, জেলার মধ্যে সাবেক ভুখোড় জুয়াড়ী ঈশ্বরদাস। সরকারের খাতায় লাল কালিতে নাম লেখা আছে তার।

সেবার বড়বাগানের মেলায় স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ওর হাত সাফাই দেখে তাজ্জব বনে গেছে। চোখের কাজল পর্য্যন্ত বাজির দানে জিতে নিতে পারে ঈশ্বরদাস সেই দিগ্বিজয়ী দিগবরবাপের ব্যাটা ওই জগন্নাথ।

ভর যোয়ান মরদ, কচি সতেজ শালগাছের মত লকলকিয়ে উঠেছে ক'বছরেই। ছেলেবেলা থেকে বাপের কাছে তালিম পেয়ে

আজ তালেবর হয়ে উঠেছে জগন, চুটিয়ে চালাচ্ছে দুই পুরুষের কায়েমী ব্যবসা। বেশ গুছিয়েও নিয়েছে।

তাই চাকলার লোকে বলে—বাপ্‌কো বেটা সিপাই কো ঘোড়া, কুছ নেহি তব্‌ থোড়া থোড়া।

বাপের বেটা অন্ততঃ বাপের কিছু গুণ পাবেই—পেয়েছেও। অই বোধ হয় জগন দাস এর মধ্যেই হাত পাকিয়ে ফেলেছে। পকেট মারে না, চুপি চুপি গিয়ে পথিকের অজানতেই একলা পেয়ে তাকে পেছন থেকে ঘায়েল করে লুটপাট করে উধাও হয় না, রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত গৃহস্থের বাড়ী চড়াও হয়ে মশালের আলোয় আর গর্জনে বীভৎস পরিবেশ সৃষ্টি করে মারধোর করে বাক্স সিন্দুক ভেঙ্গে গৃহস্থকে ধনে-প্রাণে মেরে রাতেব অন্ধকাবে লুঠ কবে উধাও হয় না।

জালিয়াতি—ধাপ্পাবাজির যুগ, জগন্নাথ লোককে প্রলোভন দেখিয়ে দশটাকার নোট একশো টাকায় বদলে দেবে দ্রব্যগুণে তাও নয়, বাজে ধাপ্পা দিয়ে এক কানাকড়িও আত্মসাৎ করে না। কথা-বার্তাও তেমনি ভদ্র। ঠকানোয় সে নেই। ওপথ এড়িয়ে চলে।

তবে? তার পথ এর থেকে আলাদা, তার কাজ অতি সামান্য—বাপের আমলের ব্যবসা নিয়ে আছে। বেশ তালিম নিয়ে লিখতে হয়েছে। এ বিদ্যাতে হাত মন চোখ এবং সবচেয়ে বড় অভ্যাস সাবধানী পলায়ন সেটা ও রপ্ত করতে হয়েছে। ঈশ্বরদাস তখন প্রৌঢ় হয়ে উঠেছে, চোখের মার কমে আসছে। তবু একাই একশো, হাতটা তাব মেসিন হয়ে উঠেছে।

সেদিনের কথা আজও মনে আছে জগনের। কেমন একটা নিবিড় বেদনাদায়ক সেই স্মৃতি, আজও ভোলেনি জগন। সেই ঘটনাটাই তার জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে, নোতুন খাতে বইয়েছে। কয়েক বৎসর আগেকার ঘটনা, তবু মনে হয় জগনের যেন এই সবে ঘটেছে।

বাপের সঙ্গে বের হচ্ছে মেলায়, ঈশ্বরদাস ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে চলেছে। দশাসই তাজা ভর যোয়ান জগন। বাপের মতই ছেয়ালো। ঈশ্বর হুঁসিয়ার করে —ছক মা লক্ষ্মীর আটন. মদ নেশা কার কুনদিন ছকে বসবি নাই, ফাঁক হয়ে যাবে, বিবাক।

জগন বাবার কথায় ঘাড় নাড়ে। মেলার দিকে এগিয়ে চলে দুজন। ওর হাতে ছকের পুটলি, ব্যাটার হাতে হ্যারিকেন।

শীতের শেষ। রাঢ়ের মাঠে মাঠে ধান উঠে গেছে। রিক্ত শূন্য প্রান্তর, ধরিত্রীর বুকের সম্পদভার কৃষকের ঘরে বাঁধা। শীতের আমেজ আকাশ বাতাসে। মনেও একটু সুর বাজে ওদের। ঘরের মজুত ধান তখনও ফুরোয় নি। ফূর্তি-আর্তি করবে এই ক'টা মাস, তার পরই তো ধার দেনা আর নেই নেই রব।

চিরদিনই তাদের অভাব। সেই অভাব দুঃখকে ও কদিনের জন্য তারা ভুলতে চেষ্টা করে বেহিসেবি হয়ে।

শীতের ধোয়াটে আমেজ সন্ধ্যার পল্লীপ্রান্তরে আখক্ষেতের মাথায় আবরণের অস্বচ্ছতা এনেছে। ম্লান রূপালী আকাশে উড়ে যায় ঘরফেরা পাখীর দল। তাদের কল কাকলিতে আকাশ ভরে উঠেছে।

এই সময় বসে মেলা। গ্রামের বাইরে সোনা ফসলের ক্ষেত, রিক্ত-শূন্য মাঠ ভরে উঠেছে ছোলা মটরের সবুজ পরিবেশ, গ্রামের বাইরে একখানা মাঠ পেরিয়ে বসেছে গোপীবাগানের মেলা। রায়-বাবুদের আমবাগানে সবে আমের বোল এসেছে, বাগানের মাঝখানে একটা ঘাটলা বাঁধান পুকুর, জল শুকিয়ে এসে তলে ঠেকেছে একটু কাদাগোলা শেওলাভর্তি জলের ছোঁয়া ; চারি পাশে বসেছে দোকানদানি। দু একটা করে জ্বলে উঠছে পাঞ্চলাইট, হেসাকের আলো। দোকানদারও যাযাবর হয়ে ওঠে এই সময়। এ মেলা

থেকে সে মেলার যাত্রী তারা। গরুর গাড়ী বোঝাই মালপত্র সাজ-সরঞ্জাম ঠাট-বাট নিয়ে এক জায়গার মেলা শেষ হলে অন্য মেলায় গিয়ে হাজির হয় আবার। টিনের বেড়া ঘেরা দেওয়াল, উপরেও ওই ছাউনি, সামনে চটের ঝাঁপ। খাবার-মনোহারি, চায়ের দোকান, সপ-মাদুর লোহার কড়াই বালতির দোকানও আছে। ওদিকে বসেছে বালাখেলা, অর্জুনের লক্ষ্যভেদ, নাগরদোলা, বড় একটা তাঁবুতে গোটা কতক ডেলাইট জ্বলছে। ভিড় জমেছে সেইখানেই বেশী। বাইরে একটা মাচানের উপর একটা লোক সেজেগুজে লম্বা নাক নেড়ে কাগজ খেয়ে চলেছে আর নাচছে তালি দেওয়া প্যান্ট পরে ব্যাণ্ডের তালে তালে পরম উৎসাহে। কাগজ না খেলে যেন বাঁচেনা সে এমনি ভাব-খানা, ও তার রোজকার খাবার, শেষকালে কাগজের নল বের করে মুখ দিয়ে। ওদিকেই বসেছে স্বর্গীয় গণপতিবাবুর প্রিয়তম ছাত্রের ম্যাজিক-এর তাঁবু। সব সাহেব এ পাড়ায়। সার্কাস-ম্যাজিকের লোকেদের সন্ধ্যার পর কাপড় পরতে মানা। ছেঁড়া প্যান্ট পরে একটা লোক (বোধ হয় প্রিয়তম ছাত্র স্বয়ং) তিনটে বালা কেবল জুড়ছে আর হুস করে জোড় খসিয়ে ফেলছে এক ঝটকা টানে। তালিমারা ব্যাণ্ড বাজছে সেই সঙ্গে বড় কত্তাল একজোড়া, লোকটা নাচছে রং মেখে আরও অনেক খেলা ভিতরে দেখান হবে, এটা নমুনা খেলা মাত্র তিন আনার টিকিট কেটে ভিতরে ঢুকলে বহুৎ তাজ্জব খেলা দেখতে পাবে—বহুৎ আইটেম।

লোকটা কেবল চেঁচাচ্ছে—চালু হোগা! চালু হোগা! এ বাবু! টং টং ঘণ্টা পিটছে।

...ওদিকে মেলা কর্তৃপক্ষের যাত্রা-গানের আসর বসবে তারই আয়োজন চলেছে। সামিয়ানা টাঙ্গানো আসর, লাল শালুমোড়া খুঁটিগুলো থেকে আসমানে, ঝুলছে কয়েকটা ডেলাইট। ইতি মধ্যেই দূরদুরান্তরের গ্রাম থেকে লোক আসতে সুরু হয়েছে, হ্যারিকেন নিভিয়ে শিশির ঝরা রাতেই তারা চাপ চাপ বসেছে, জায়গা দখল

করে দলবেধে সারারাত থাকতে হবে। একজন তামাক সাজছে পাল্লা করে তাই টানছে তাদের দলের সকলে। হাতে হাতে ফিরছে হুঁকোটা সমবেত কাশির শব্দ ওঠে কড়া তামাকের ধমকে। ওদিক থেকে কে বিরক্ত হয়ে বলে উঠে—এরি মধ্যেই গালবাদ্যি লাগালি বাবারা, যাত্রা সুরু হলে কি করবি মাণিক? হুঁকোর জল ফিরিয়ে আন লব চাঁদ।

যতদূর চোখ যায়, আবছা অন্ধকারে দেখা যায় মাথা আর মাথা, কালো আবছা মাথাগুলো আলোর সীমানা ছাড়িয়ে প্রায়ান্ধকারে গিয়ে পৌঁচেছে। মাঠে হালের কাজ সেরে ওরা এসেছে সন্ধ্যাবেলায়—সারা রাত গান শুনে ফিরে গিয়ে আবার সকালে দু'তিন ক্রোশ পথ হেঁটে বাড়ী গিয়ে ফের হালগরু নিয়ে বেরুবে, কঠিন কঠোর পরিশ্রমের ঠাসবুনোট ভরা দিন। এতটুকু ফাঁক ফাঁকি নেই সে জীবনে। কঠিন উষর জীবনে এই যাত্রাটাই তদের প্রধান আকর্ষণ। এইটুকু গান শোনার স্মৃতি আবছা আলো ঝলমলে পোষাক পরা রাজা মন্ত্রী রাণীর দল তাদের মনে বহু কর্মক্লান্ত দুপুরে—অলস বৃষ্টিঝরা সন্ধ্যার বৈঠকে নির্জন গ্রামপ্রান্তে আনন্দের খোরাক হয়ে থাকবে।

সেই পরম আনন্দ সঞ্চয় আর ভাগ্যবদলের আশা নিয়ে ওরা আসে মেলার আলো ঝলমল পরিবেশে। সব অভাব দুঃখের স্মৃতি তারা ভুলতে চায়, ভুলে যায়।

···এদের সেই স্বপ্ন ব্যাকুল মনের চরম দুর্বলতা নিয়েই ঈশ্বর দাসের ব্যবসা। মেলার জাঁকজমক আলো—ব্যাণ্ডের সুর অন্ধকারের বুকচিরে শূন্যপথে আলোর তির্যক বিচ্ছুরণ কেমন একটা স্বপ্নময় অন্য-জগৎ তৈরী করে ওদের মনে। যেখানে অভাব নেই—দুঃখও নেই, আছে শুধু পাবার স্বপ্ন। দু'হাত ভরে পাওয়া।

যাত্রার আসরের কাছাকাছি মুখ আঁধারে এই জায়গাতেই বসেছে ঈশ্বরদাস ছক পেতে। হ্যারিকেনের ম্লান লালাভ আলোয় আমগাছের নীচে পেতেছে অয়েলক্লথের ছক খানা। ছ খোঁপ করা ছক। জাহাজ

কাঁটা-ইস্কাবন, চিড়িতন, রুইতন, আর হরতন। চামড়ার তৈরী এক মুখ খোলা কৌটায় হাতের ঘুঁটিকটা নাড়াচাড়া করতে করতে হাঁক ছাড়ে নিজের অস্তিত্ব জানান দিতে।

—ভাগ্যের খেলা। রাজা উজীর হয়ে যাবে। একে চার মিলবে।

চারিদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে চাষী, মজুর-মজুতদার-বাজায়ের ফড়ে, বেশ্যাপটির বহু ভেড়ুয়া। এই সময় তাদের কাজ নেই। মেলার ধারে কর্তৃপক্ষ তালপাতার ছাঁউনি করে দিয়েছে, সেই খানে বসে দেহপসারিণীদের মেলা, ধেনোমদের স্রোত বয়ে যায়। চাষীর সারা বছরের সঞ্চয়ের একটি বৃহৎ অংশই অদৃশ্য পথে হারিয়ে যায়, বিনিময়ে তারা নিয়ে যায় বংশের উপর অভিশাপ। ওই মেয়েদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত একটু নাচ গান জানা মেয়েরা আমগাছের ডালে হ্যারিকেন ঝুলিয়ে নাচের আসরে বসায়। ঢোল কাঁসি আর গানের সুরে সুর মিলায় মত্তপ কণ্ঠের জড়ানো চীৎকার, একপাল জানোয়ার যেন মেতে উঠেছে। এমনি করে অন্ধকার পথে চলে জীবনের অপমৃত্যু। তবু লোকের ভিড় জমে ওই আঁধার পুরীতেই, খদ্দেবের ভিড়। এই সময়টা বেশ্যাপল্লীর রক্ষক নিষ্কর্ম্মার দল এসে ভিড় করে ঈশ্বর দাসের এই ভাগ্য ফেরাবার ছকের চারি পাশে, ফুটো ভাগ্য তাদের ফেবে না তবু।

টাকা, আধুলি, সিকি পড়বে টুপ টাপ এঘব ওঘরে। ঈশ্বর দাসের মত পাকা খানদানি খেলুড়ের ছকে চার আনার কমে দান নেই। ফেঁতি খেলোয়াড়দের জন্য আছে অন্যত্র চার পয়সাব দান, যাক তারা মদন গরাইয়ের ছকে।

নিপুন হাতে ঘুঁটিগুলো পড়ল ছকের উপর ছত্রাকার হয়ে। ব্যগ্র হয়ে দেখছে সবাই। ছকের উপর জমা করছে ওদের বহু কষ্টের পয়সা। সারা বছর রোদে জলে বৃষ্টিতে শরীর পাত করে উৎপন্ন করেছে ধান-কলাই। তাই বিক্রিকরা পয়সা। তাই এতে ভাগ্য বদলের আশা দেখছে তারা।

মাগ ছেলের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে আনা প্রতিটি পয়সা ; ওতে

মিশে আছে কত আশা নিরাশায় ভরা দীর্ঘশ্বাস, কত স্বেদবিন্দু কত ব্যাকুল বেদনা।

কিন্তু অবাক হয় তারা, ঈশ্বরদাস ঘুঁটি ফেলেছে এমনি একটি ঘরে যেখানে বিশেষ কোন দান টাকার বাজী নেই। ফাঁকা ঘর, একদম ফাঁকা। জগন হ্যারিকেনের পাশে বসে দেখছে বাবার হাতের তুটো আঙ্গুল কেমন চকিতের মধ্যে ঘুঁটিগুলো ছিটিয়ে পড়বার আগের মুহূর্তে কি যেন একটা করল, চোখের পলকে ঘটনাটা ঘটল, তার ফলও ফলেছে হাতে হাতে চোখের সামনে ছকের উপর। সব তারই ঘরে আসছে।

টাকা, আধুলি, সিকির রাশ কুড়িয়ে খেরোর থলিতে পোরে ঈশ্বরদাস। এ তার কাছে অতি সাধারণ ব্যাপার। মাত্র আঙ্গুলের তুটো টান, ঘুঁটি স্রেফ বদলে যাবে, সব কিছু তার ঘরে আসে। মাঠে যেন পৌষের শেষে ধান ঝাঁটিয়ে গাদা করার মতই সোজা ব্যাপার।

কোনোদিকে না চেয়ে ঈশ্বরদাস থলিতে পয়সা গুলো ওদের চোখের সামনে পুরে আবার দান হাঁকতে থাকে।

—ভাগ্যের খেলা। নসীবের খেল বাবু।

আবার দান পড়ছে। মরীয়া হয়ে উঠেছে ওরা, ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে প্রতিবাদ করবার কিছুই নেই। ঈশ্বরদাস চুরিও করে নি, এ স্রেফ বরাত! ফুটো বরাত না হলে এক ঘরে না পড়ে অন্য ঘরে দান পড়ে! কেউ কেউ কথাটা মানে। তাই আবার বাজি ধড়ে।

...সুতরাং এবার ভাগ্য নিশ্চয়ই ফিরবেণ কোন চাষী বৌএর জন্য একটা কাঁচ বসানো আয়না কিনতে এসেছিল। বারো আনা সে শেষ সম্বলই এনে বসেছে। তাও কোন দিকে চলে গেল তার। ওদিকে যাত্রার আসরে বাজছে প্রথম ঘণ্টার কনসার্ট পার্টি; প্রায়ান্ধকার পরিবেশ ভরে ওঠে সুরে সুরে। ওরা কেমন মরীয়া হয়ে ওঠে কিসের নেশায়।

হঠাৎ কেমন যেন কোনদিকে গণ্ডগোল হয়ে যায়। বাতাসে কিসের গন্ধ। হুঁসিয়ার ঈশ্বরদাস কদম ছাঁট পাকা মাথাটা তুলেই এক নিমিষে সেই গন্ধ পায় বাতাসে। পরিচিত সেই ইসারা। নিমিষের মধ্যে হেঁচকা টানে টাকা সিকি সমেত ছক খানা গুটিয়ে নিয়ে হ্যারিকেনটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে ভিড় এড়িয়ে দৌড় মারে।

কে বলে ওঠে—পালা, পুলিশ।

জনতাও চীৎকার করে ধরবার জন্য আসে। জগনকে কারা যেন ধরবার চেষ্টা করছে। তাড়িয়ে আনছে তাকে। নাকের উপর ছিটকে লাগে প্রচণ্ড আঘাতটা। কেমন যেন আবছা অন্ধকারে ঠোঁটটা কেটে যায়; জিবের ডগায় নোনতা আস্বাদ লাগে, জ্বালা করছে ঠোঁটটা। মেলার পরিবেশ ছেড়ে অন্ধকার মাঠে নেমে পড়েছে জগন। দৌড়চ্ছে প্রাণপণে, পিছু পিছু কারা আসছে। চোখের সামনে ঘুব-পাক খাচ্ছে মাঠ, আলপথ সবকিছু। কোনরকমে পড়তে পড়তে রয়ে গেল। হাতে শক্তকবেধরা টাকা পয়সার থলিটা। বেশ বুঝতে পারে জগন ওদের লোভ ওইটার দিকেই!

খেলায় ঠকে গিয়ে মাতাল লোক ক'জন ক্ষেপে উঠেছে। থলিভর্তি টাকা আধুলি দেখে কেমন মেতে উঠেছে ওরা। তাই লুব্ধ জানোয়ারের মত ঝাঁপ দিয়ে পড়ে কেড়ে নিতে চায়, না পেলে চরম আঘাত হানতেও দ্বিধা করবে না।

মেলার আলো দু এক ফালি গাছের জমাট অন্ধকার ছায়া প্রহরা ভেদ করে ছিটকে প'ড়ছে সবুজ ছোলা ক্ষেতের এদিকে ওদিকে। জমাট অন্ধকারকে ফালা ফালা করে কাটবার দুরন্ত চেষ্টা ওতে ফুটে ওঠে। ছায়ামূর্তি ক'টা অন্ধকার আলপথে ছুটে চলছে তাকে তাড়া করে ক্ষুধার্ত্ত পশুর মত। বুকটা কাঁপছে জগনের, এমনি করে পালাতে অভ্যস্ত নয় সে। এই জীবনে সবে হাতে খড়ি পড়েছে। তবু বাঁচবার দুর্বার আগ্রহ তাকে মরীয়া করে তোলে। দৌড়চ্ছে সে অন্ধকারেই।

উঁচু আলের কোলে ঘন ছোলা আর গমক্ষেতের মধ্যে মধ্যে খরগোসের মত সটান ঢুকে পড়ে থাকে নিশ্বাস বন্ধ করে টানটান হয়ে, মনে হয় বুকের শব্দটা প্রচণ্ড বেগে উঠছে সব স্তব্ধতা মেলার ওই কোলাহল কর্ণেটটার তীব্র শব্দ চাপিয়ে। ওরাও এদিক ওদিকে খুঁজছে হতাশ হয়ে।

ওদের সন্ধানী কণ্ঠস্বর ভেসে ওঠে— শালা ছুটোই ভেগে গেল?

—ই আঁধারে কুথায় খুঁজবি আর, চল।

কে জবাব দেয়—ধ্যেৎ, পেলে একবাব দেখতাম ব্যাটাকে।

—চুঃ, বেশ মালকড়ি ছিল রে।

আপশোষ করছে তাবা। একে একে সাববন্দী হয়ে ছায়ামূর্তি গুলো ফিরে চলেছে পাশের উঁচু পগারেব উপর দিয়ে মেলার পানে। চুপ করে পড়ে আছে জগন গায়ে পায়ে সুড় সুড করে বিঁধছে গমের ধারালো পাতা আর শিষগুলো। একটু অসাবধান হলেই টের পেয়ে যাবে, নেকড়ের মত লাফিয়ে পড়ে ধারালো দাঁত দিয়ে ফালা ফালা কবে দেবে তাকে। ঠিক কণ্ঠস্বর শুনে চিনতে পারে না, মনে হয় ঈশ্বরদাসেব কোন প্রতিপক্ষ দলই লোকজন নিয়ে চড়াও হয়েছিল, —মেলার সব পয়সা একা ওই ঈশ্বরে ব্যাটা টানবে কেনে? বেশ রেগে বলছে তারা।

কে যেন বলে ওঠে—

বোজ রোজ ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান

একদিন ঘুঘু তোমার বধিব পরাণ।

ঈষৎ জড়িত কণ্ঠস্বব। বুঝতে পাবে জগন বেশ্যাপল্লীব ভেড়ুয়ার দল। ওরাই ওদের সঙ্গে যোগ-সাজস করে গোলমালটা বাধিয়ে কোনরকমে তহবিল কেড়ে নিতে চেয়েছিল। কুকুরের দল। নিষ্ফল রাগে কাঁপছে জগন।

পায়ের শব্দটা মিলিয়ে গেল মেলার দিকে। মিলিয়ে গেল ওদের কণ্ঠস্বর। তখনও চুপ করে পড়ে থাকে জগন পগারের কোলে

অন্ধকার রাতে।

রাতের হিমেল বাতাসে ভেসে আসে মটর ফুলের মিষ্টি গন্ধ। কেমন ভিজে ভিজে গাছগুলো! রাতের অন্ধকারে ফিকে কুয়াসা জমাট বাঁধছে বায়ুস্তরে, কাচরং আকাশে দু একটা তারার চুমকী বসানো। স্বপ্নময় মধুর একটি পরিবেশ।

বুকের কাঁপুনি থেমে গেছে। আবার অতল শুদ্ধ শান্তিময় রাত্রির গভীরে নিজেকে ফিরে পায় জগন। তহবিলটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল। তখনও বুক কাঁপছে অজানা ভয়ে। বাবার কোন হদিস ও জানে না। চারিদিকে সাবধানী দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখে, ওরা কেউ কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা। না! কেউ কোথায় নেই।

পিছনে পড়ে রইল মেলার আলোজ্বালা আনন্দমুখর পবিবেশ, আলপথ ধরে সামনের অন্ধকার ঘেরা গ্রামসীমার দিকে এগলো সে। নিশ্চিদ্র অন্ধকার ঢাকা আকাশতলে কালোরেখোর মত টানা একটি অস্তিত্ব, এই তার গ্রাম।

সুপ্তিমগ্ন পথ, ক্লান্ত নিদ্রাচ্ছন্ন পল্লী। রাতের বাতাসে মেলার যাত্রার দলের বক্তৃতার শব্দ ভেসে আসে, আবার কেমন স্তব্ধতা। নামে গ্রামপথে। এগিয়ে বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো জগন।

বাড়ীতে আপন বলতে কোন দূর সম্বন্ধের এক মাসীমা। ঈশ্বর-দাস কবে কোত্থেকে কোন সুবাদে এনেছিল তাকে জানেনা, রয়ে গেছে সে এ বাড়ীতে। এ বাড়ীর একজনই হয়ে গেছে। বয়সের তুলনায় দেহের বাঁধন এখনও আটো সাঁটো—শক্ত সমর্থ। ঈশ্বরদাসও ভয় করে তাকে।

অন্ধকার রাত্রে জেগে থাকা তার অভ্যাস হয়ে গেছে। কান দুটোও সজাগ রাখত। তাই বাড়ীর কাছে আসতেই মাসী যেন টের পেয়ে এগিয়ে আসে: দরজা খুলে বলে ওঠে—এলি রে? সে কই? তোর বাপ! তাকে দেখছিনা?

ঈশ্বরদাসকে এখনও বিশ্বাস করে না সে।

—আসেনি ? ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করে জগন, তার কণ্ঠস্বরে একটা উৎকণ্ঠা ফুটে ওঠে !

মাথা নাড়ে মাসী ; কি ভাবছে জগন। ছাড়াছাড়ি হয়েছিল দুজনের সেই মেলা থেকেই। বিপদের সময় দুজন একদিকে ছোটে না; এটা তাদের নিয়ম ঈশ্বর ছুটেছে উত্তরে, জগন সোজা দক্ষিণে তাদের গ্রামের চেনা মাঠের আল ভেঙে ! রাত অনেক হয়ে গেছে এখনও ফেরেনি বাবা। জগন কি করবে ঠিক করতে পারে না।

একটা হিসাবে ভুল করেছিল ঈশ্বরের মত পাকা খেলুড়ে। এক চারে বসেই পরপর রুই কাতলা শিকারের চেষ্টা করে ব্যর্থ লুঠেরা জনতা যে এমনি করে বিলকুল সব ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করতে পারে— কাঁচা পয়সার লোভে সে কথাটা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল। দানের পর দান তুলেছে ঘরে, ওদিকে প্রতারিত জনতা মারমুখী হয়ে উঠবে, এগিয়ে এসে বাধা দেবে অন্য বিপক্ষ দল তা ভাবে নি। কেমন মেতে উঠেছিল তারা।

জগনও এ কথাটা মোটেই ভাবেনি। বাবার হাতসাফাই আর ছক পাতা দেখছিল অবাক হয়ে। মাঝে মাঝে নিজেও দানে বসেছে। যেন হাতের ঘুঁটির গুণ, যা বলাবে তাই বলছে ঘুঁটি আপনা থেকেই অন্য কোনদিকে নজর দেয় না। তার ফলেই আজ এই চরম বিপদে পড়েছে তারা। মস্ত ভুল করে বসেছে।

চোরের মায়ের কান্না—জোরে না, গলা ফাটিয়ে ও না বুক চাপা গুরুগুরু ফোঁপানিই সার। জগনের রাত্রি কাটে পায়চারা করে। এ খবর হাঁকডাক করে বলার নয়। সকালে যা হয় করবে।

ভোর বেলাতেই ঈশ্বরদাসকে কারা তুলে আনে মাঠ থেকে। যাত্রা শুনে মাঠ দিয়ে ফিরছিল তারা। দেখে আলের পাশে কাৎ হয়ে পড়ে গোঙাচ্ছে একটা লোক। পাশপাশি গাঁয়ের বাসিন্দা ওরা—চেনে ওকে সবাই। ঈশ্বরের মাথায় কে বাড়ি মেরে চৌফালা করে দিয়েছে। শীতের শক্ত মাঠের মাটি রক্তে ভিজে গেছে : জমাট বেঁধেছে রক্ত ওর

জামাকাপড়ে ; শীতের রাতে সারাটা ক্ষন হিমে পড়ে থেকে অচেতন হয়ে গেছে।

শিউরে ওঠে জগন। এতটা সাংঘাতিক হবে কল্পনা করেনি। নেকড়ের দল তাড়া করে এমনি সর্বনাশ করে যাবে ভাবেনি। তাকেও ধরতে পারলে বোধ হয় এই হাল করে ছাড়তো। বুড়োর বগলে দাবা রয়েছে সেই ছক, কৌটা, ঘুঁটি সবকিছু। মরবার আগ মুহূর্ত পর্য্যন্ত সেটা নিজের জিম্মায় রেখেছিল, ছেলের হাতে পৈতৃক সম্পত্তিটা তুলে দিয়ে যেতে।

জগনের চোখ দিয়ে এক ফোটা জলও পড়ে না, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পাড়া পড়শী, কৌতূহলী জনতা এসে ভিড় জমায়। মাসী বুক ফাটিয়ে কাঁদছে পাড়ামাথায় করে।

—আমার ইন্দিরপতন হয়ে গেল গো। চুড়ো খসে পড়লো গো।

দারোগাবাবু কনেষ্টবল নিয়ে এসে জুটেছে। এদিক ওদিক তদন্ত করে, ডায়েরী খাতায় কি সব লেখা জোখা সেরে বলে ওঠে জগনকে —তোমার কাউকে সন্দেহ হয়?

জগন চুপ করে থাকে। কাকে সন্দেহ করবে! কার নামইবা করবে। গালকাটা সেই ভেড়ুয়া, ন্যাড়ামাথা গোকুলপুরের ডাকাত সর্দার? ছকের চারিপাশে আরও অনেককে দেখেছিল সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ঘোরা ফেরা করতে। গোকুলপুরের নেড়া গয়লা তো একবার লাফ দিয়েই উঠেছিল—দেখে লুব ঈশ্বর তোকে!

ঈশ্বর হাসছিল—ধম্মের খেলা ভাই।

আরও কে কে ছিল। কি হবে তাদের নাম করে? না! পারে সেই দেবে জবাব—নাম করে লাভ নেই। ব্যবসার ক্ষতি হবে ওরা চটে থাকলে।

মাথা নাড়ে জগন—না, কাকেও সন্দেহ করি না আজ্ঞে। রাত-দুপুরে কে কি করলো—কি করে বলি?

—লাশ সহরের মর্গে যাবে।

—আজ্ঞে! চমকে ওঠে জগন।

জগনকে শেষ সৎকারও যেন করতে দেবে না। চুপ করে থাকে জগন। ঈশ্বরদাস—এ চাকলার দিগ্বীজয়ী খেলুড়ে শেষকালে এমনি অপঘাতে মরবে স্বপ্নেও ভাবেনি। সব শেষ হয়ে গেল তার।

সে আজ কয়েক বৎসর আগেকার কথা। সেই স্মৃতি মুছে যায় নি জগনের মন থেকে। এখনও সে একটি বেদনাদায়ক অনুভূতি। বাবার বৃত্তিই নিয়েছে সে, ঈশ্বরদাসের বিদ্যার শেষ হয়নি।

জগন ধীরে ধীরে মাথা তুলেছে। বাপ কা বেটা হয়ে উঠেছে সে। ছকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই তার কাজ, পিতৃ বিদ্যা। তাসের খেলা তার দেখবার মত। বেশ নিপুন ভাবে রপ্ত করেছে। সাহেব বিবি গোলাম, তিনখানা মাত্র তাস বিদ্যুতের মত বেগে আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে ঘোরে একাকার হয়ে, এখুনি সাহেব—উই বিবি উই গোলাম! না, কোন কিছুই নয়, সেই তাসখানাই দু'আঙ্গুলের ডগে ধরা আছে। তাজ্জব ব্যাপার।

লোকে বলে—যাদু জানে।

ভালো মাইনে দিয়ে কতবার মেলার ম্যাজিকের দলে নিয়ে যেতে চেয়েছে তাকে। ওই মেলার তাঁবুতে এত লোকের সামনে দাঁড়িয়ে শুকনো তাসের খেলা দেখাতে চায় না সে। জ্যান্ত বিদ্যা সার্থক হলে এ বিদ্যায় সব আসবে তখন। তাই যায় নি ওদের ডাকে।

হাসে জগন—এক মিনিটের রোজকার। স্বাধীন জীবন। চাকরী সে নেবে না। জবাব দেয়।—না, ওসবে যাবো না বাবু।

ঈশ্বরদাসের জীবনের শেষ মুহূর্তটা ভোলেনি। রাতের অন্ধকারে ওই নিষ্ঠুর লোকগুলোর হাতে প্রাণ দিয়েছিল সে, নিষ্ঠুর পৈশাচিক সেই মৃত্যু। তবু ঈশ্বরদাস অন্য পথে যায় নি। বলতো—

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয় বাবা।

রক্তের সঙ্গে মিশে গেছল তার অর্থের নেশা। এই পথেই সেটা পাবার স্বপ্ন দেখেছিল সে। বাপকো বেটা। জগন বাবার সেই কথাটা ভোলে নি।

বাবার সেই দুর্বার নেশা তার মনের কামনায় দেহের রক্তের উষ্ণতায় হয়তো মিশে গেছে তার অজানতেই।

দিন বদলেছে, ক্রমশঃ সেই ব্যবসারও রূপ বদলেছে জগন নিজের মাথা খাটিয়ে। সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে রীতিমত দল গড়ে তুলেছে, একা আর থাকে না, খেলে না।

কয়েক মাস যাযাবর জীবন। বাবার মত লুকিয়ে ছাপিয়ে মেলার ভিতর বসে দু এক ঘণ্টায় লোকের থলি ঝেড়ে নেবার মত ব্যবসা করে না জগন। আইন ও সদাশয় হয়েছে। মেলা কর্তৃপক্ষকে টাকা সেলামী দিয়ে রীতিমত প্রকাশ্যেই বসে তার খেলাব আসর; ভদ্রলোকেবাও আসে সেখানে তাছাড়া বাঁধি দোকানও করেছে; লাল সালু দিয়ে টাঙ্গানো—"দি গ্রেট কার্ণিভ্যাল" এইটা তার অতি আধুনিক খেলার আসর। ঠিক জুয়ার ভদ্রতম সংস্করণ।

টিনের চালার একদিক থেকে অন্যদিকে তীর ছুঁড়তে হবে, নানা লক্ষ্য ভেদ করার ব্যাপাব; তাছাড়া আরও খেলা আছে। বড় টেবিলে টাকা আধুলি সিকি পাশাপাশি সাজানো, এক আনায় দুটো বালা কিনে ছোঁড়া। ছেলেবাও খেলা বলেই এসে থাকে, নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ। বালা ছুঁড়ে দিল একদিক থেকে টেবিলের উপর সাজানো পয়সা লক্ষ্য করে, বালা গড়ান দিচ্ছে টেবিলের উপব পয়সার ভিড়ে। গড়িয়ে গড়িয়ে গিয়ে বালা যেটাকে বেষ্টন করে পড়বে সেইটা তোমার। কিন্তু বেষ্টন করে বালা আর ঠিকমত পড়ে না। পড়ে একেবারে নীচেই। ভোঁ ভোঁ। গেল পয়সাটা। এমনি কোরেই নেশা চেপে খায় তাদের।

জিদ ধরে আবার কেনো বালা।

সাতে পাঁচে জগন চালিয়েছে মন্দ নয়। ধান ওঠার পর থেকে মুর্শিদাবাদ, বীরভূমের প্রান্তরে বহু মেলায় ঘোরে সে। গোপীনাথপুরের মেলা, তারপর মাঠের মধ্যে মজা কান্দরের ধারে কেশের পাড় সেখান থেকে বাদশাহী কাঁচা শড়ক ধরে ময়ুরাক্ষী, কাণা, কুয়ে নদী পার হয়ে ধূ-ধূ মাঠ ভাঙ্গা-মসজিদ পার হয়ে কোশ চারেক দূরে দইদে বৈরাগীতলার মেলা, আরও যাও ধুলোঢাকা গ্রাম ছাড়িয়ে! সেখান থেকে ছোট লাইন ধরে দুটো ইষ্টিশান পারে জল্পেশ্বরের মেলা। নামী হাঁকডাকের মেলা। বহুলোক সমাগম হয়। আরও আছে অনেক মেলা।

শীতের আমেজ ফিকে হয়ে আসছে, গাছে গাছে পাতা ঝরার পালা। এগিয়ে যায় আবও কয়েক ইষ্টিশান—পুরোণো বনেদী জমিদার প্রধান গাঁ লাভপুরের ধারে জাগ্রত ঠাকুর ফুল্লরাতলার মেলা; এখানেও শেষ নেই মেলার।

মাটির রং বদলাচ্ছে। ক্রমশঃ লাল গেরুয়া মাটি, আশপাশে গজিয়ে ওঠে শালবন। পলাশের পত্রহীন ডালে জমাট লাল নেশার আমেজ। চলো আরও এগিয়ে।

ধানক্ষেত আর গ্রামসীমার চিহ্ন এখানে এসে বদলে গেছে। উঁচু টিলার উপর থেকে চোখ মেলে চাইলে দেখা যাবে সবুজের শেষে ধূ ধূ সাদা বালুচব, মানাবন। কাশেব ফুল ফোটা থেমে গেলে শীতের কঠিন শাসনে, হলদে বিবর্ণ হয়ে আসে সবুজ গাছগুলো। ওপারের মাটির বং লালচে হয়ে উঠেছে—কাছিমের পেটের মত উঠে গেছে—দূরে ঘন সবুজ আর হলুদেমেশা শালবন সীমার দিকে।

বাতাসে ওঠে একতারার রিণি রিণি সুর। গেরুয়া মাটিতে রং মিলিয়ে চলেছে গেরুয়া আলখাল্লা পরা বাউল বৈষ্ণবদল জয়দেব কেন্দুলির মেলার দিকে। সময় নেই।

একদিন মাত্র এর লগন। মকর সংক্রান্তিতে ওই মরা নদীর খাতে কালো স্বল্পজলধারার স্রোতে উজান বেয়ে আসবে পাপহারিণী

মকরবাহিনী গঙ্গা। কবি জয়দেবের একটি কামনা আজও পূর্ণের প্রসাদে ধন্য হয়ে রয়েছে। সেই মুক্তি স্নানের আশায় আসে বাউল বৈষ্ণব সহজিয়াদের দল।

এদের পিছনেই মেলার সুরু বিরাট মেলা। কদমখণ্ডীর ঘাট থেকে সুরু করে গ্রামসীমা অবধি রকমারি দোকান পসার; দেশ-বিদেশের লোকজন।

জগনের ব্যবসাতি ওদের নিয়েই। বেশ জমাট মেলা। জগনের কারবারও চলে জোর। একটু বোকাসোকা চাষী গেরস্থ, বনমহাজনের লোকজন এসে নানা ভাবে কাঁচা পয়সা তুলে দেয় ওর হাতে।

শীত জমে উঠেছে কাঁকর ঢাকা মাটির বুকে, শালবন থেকে আসে হু হু শুকনো উত্তুরে বাতাস।

ক্রমশঃ শীতের আমেজ কমে আসছে। মেলার এখনও বাকী, শেষ নেই। পথের ধারেই গড়ে ওঠে মেলা পথচারী যাযাবরের জন্য, তাই এর হিসাব এখনও চোকেনি।

ঠাট বাট গুটিয়ে আবার এগিয়ে চলে জগন। বাড়ীর জন্য মন কেমন করে দলের গদাইএর।

—কই গো ঘর যাবা না?

হাসে জগন—যাবো। আর একটা মেলা দেখে যাই চল। এগিয়ে চলে তারা আবার পথে পথে।

স্বপ্নলাগা দেশ, পাখীর ডাকে ঘুমন্ত রাত্রি ভোর হয় এখানে। বাতাসে কিসের মদির সৌরভ। মহুয়া ফুল ফুটেছে থরে থরে। লাল ডাঙ্গার শেষে দেখা যায় নীল পাহাড় সীমা। থর থর কাঁপে রৌদ্রছায়া, বাতাসে মহুয়ার সৌরভ। শালবনে হলুদ পাতা এসেছে, কচি হলুদপাতা। বক্রেশ্বরের মেলায় এসে পড়ে জগন। চলতে চলতে পথ কখন এসে থেমে গেছে এক আনন্দলোকে। সারি সারি ছোট বড় মন্দির, নাট-মণ্ডপ, কয়েকটা উষ্ণজলের কুণ্ড। সব জল গিয়ে পড়ছে পাপহারিণী গঙ্গায়। শীতের আমেজে গা ডুবিয়ে

বসে থাকো—চোখ বুজে আসবে গভীর তৃপ্তিতে। সমস্ত ক্লেদ যেন মুছে যায়।

ধর্মের স্থান—এখানেও জগনের ছক পড়ে। বছরের শেষ কাঁত মেলার দেব সেবায় দান করে জগন।

মেলা শেষ। ফেরো আবার বাড়ী। এ বছরের মত মেলার কাজ খতম। ঐ ক'টা মাস কোনদিকে কেটে যায় জানতে পারে না সে। মেলার আলো-বাজনার সুর, আনন্দ মুখর পরিবেশ, কোলাহল আর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গ্রামের বাইরের বাগান কিংবা মাঠের ধারে কাটে সারাটা দিন। নগ্ন কদর্য জীবন। রাতের অন্ধকারে আবার সেজে ওঠে মেলার পরিবেশ লোকজন নোতুন সাজে। সেই ঝলমল রূপ দেখতে আসে দূর দূরান্তরের লোক; মেলার বাইরে ঘর সাজিয়ে বসা দেহপশারিণীদেব মতই মেলার নিজস্ব একটা জীবন যাত্রার সুর আছে। রাতেব অন্ধকারে হেসাক ডেলাইটের আলোয় জেগে ওঠে সেই জীবন। দিনের আলোয় জনশূন্যতায় আবাব রিক্ত শস্যশূন্য মাঠের মত হারিয়ে যায় কোন দিকে। কদর্য রূপটাই ফুটে ওঠে দিনের আলোয়।

জগনের দলে কজন ছোকরা সাকরেদ আছে। বাবার মত তেমনি কারবার সে করে না। ধর ধর দৌড় দৌড় কাজ আর নয়। আশ-পাশে থাকে তারা। সাবধানী দৃষ্টি মেলে পাহারা দেয়। তাছাড়া কার্ণিভ্যালের জন্য একটা নোতুন ধরণেব ব্যবস্থাও সুরু করবে ভাবছে। সহরে কার্ণিভ্যাল দলের সাকরেদরাও খেলে মাঝে মাঝে। খদ্দের ডাকবার অছিলায়। গড়া পেটা ব্যাপাব। দান পড়ছে ছুম দাম, হাঁকড়ে কুড়োচ্ছে তারা। তারা কেউ বিশেষ ঠকে না। জিতে যায়। তাদের আশেপাশে প্রথম এসে জমে ভীরু জনতা। খেলবে কি না খেলবে এই রকম ভাবখানা। ইতঃস্তত করে তারা।

ক্রমশঃ হাত টিপে দুচার আনার দান ছাড়ে। জগনও জানে,

তাই এ সময় আলগা দেয়। তারা বাজী জেতে। টাকা সিকিটাও পায় উপরি। ক্রমশঃ রোখ চাপ্লতে থাকে। তারপরই সুরু হয় খেলার দৌড়।

দেখাদেখি পড়তে থাকে কাঁটায় এক কিতে নোট, ওদিকে পড়ল পাঁচ টাকার কয়েকখানা। পাঁচ দশের কাগজ যেন বাতাসে উড়ছে, ঝড়ে ওড়া শালপাতার মত।

হুসিয়ার খেলুড়ে। হঠাৎ জাহাজ ডুবে গেল, ভরা ডুবি যাকে বলে। মাথায় হাত দিয়ে বসে হাউসে জনতার দল। চোখের নিমিষে দান উলটে পড়েছে জাহাজ, কাঁটা থেকে একেবারে ইস্কাবনের টেক্কায়। জগনের মুখে কোন ভাবান্তর নেই। সহজ ভাবেই টাকাগুলো কুড়িয়ে নেয়, এক মুঠো নোট। সবই নসিবের খেলা। থাকে আবার পাবে —ধরো দান। খোঁড়া বিড়ালের আরসুলা পথ্যি, ওদিকে সিকি আধুলির দান দু-একজন খুব মারছে। এক টাকা খেলে চার পাঁচ টাকা করেছে।

বন্ধুরা ডাক দেয়,—এ্যাই পালিয়ে চল, ঢের পেয়েছিস।

ছেলেটার রোখ চেপে গেছে, তারপরেই ভরাডুবি। জগন মাত্র দুটো কথা বলে—রং নিয়ে খেলা বাবু, নসিবের খেলা। দেখেন ই-দান কি আসে। কেউ জানে না, আমির না হয় ফকির।

…চোখ দেখে লোক চেনে সে। কে আছে কোন মতলবে। অমনি চোখে চোখে ইসারা হয়ে যায়, সাগরেদরাও হুসিয়ার হয়ে দাঁড়ায়।

…সেই রাতের কথা আজও ভোলেনি জগন। সাবধানের মার নেই, হুঁসিয়ার থাকা ভালো। বাবার কাছে হাত সাফাই শুধু শেখেনি। শিখেছে কি করে আত্মরক্ষা করতে হয়। বাবা প্রাণ দিয়ে ওকে সেই শিক্ষা দিয়ে গেছে। সেটা মেনে চলে জগন।

প্রায় ছ'মাস কাটে এমনি। দুপুরের তাম্রাভ খর রোদে থরথর কাঁপে আকাশ বাতাস। মাটির বুক ফুঁড়ে যেন হাজারো নাগিণী

ফণা মেলে তুলে ধরেছে, ওর নিশ্বাসে হু হু অগ্নি শিখা। কেঁপে ওঠে সমস্ত আকাশ বাতাস সেই শিখার তীব্র আগুণে। মাটির বুক ফেটে পাতাল দেখা যায়। চারিদিকে হাহাকার পড়ে।

এই সময়টা বড় কষ্টের। চারিদিকে নেই নেই রব। চাষীর ঘরে অনটন। তারও রোজকার পাতি বন্ধ। কোন কাজ নেই চুপ চাপ ঘরে বসে থাকা। সেও আকাশের দিকে চেয়ে থাকে।

এই সর্বহারা রূপ জগনের কাছে অসহ্য ; তেমনি অসহ্য হয়ে ওঠে বর্ষামুখর দিনরাত্রি। মেঠো পথ ঘাট ছাপিয়ে ওঠে জলধারা, ব্যাঙের কর্কশ স্বরে ভরে ওঠে অতন্দ্র রাত্রি। এর সঙ্গে প্রাণ উচ্ছল ব্যাঙের সুর ভরা সেই মেলার নৈশজীবনের সেই অফুরাণ আনন্দ স্পর্শের সঙ্গে কোন খানেও মিল নেই।

গ্রামের সবাই নেমেছে চাষে, সারাটা দিন মাঠে জলে কাদায় থাকে। বীজ ধান রোয়, পাখনা দেয়, গরুর পিছু পিছু হাটু জলে লাঙল টিপে চলে। সন্ধ্যাবেলায় বাড়ী ফিরেই এলিয়ে পড়ে অসীম ক্লান্তিতে। এরাই যে শীতের রাত্রে মেলায় গিয়ে জমা হয় রাতের পর রাত তা চেনা যায় না। তবু বর্ষাকাল ও আসা কামনা করে জগন।

...এ সময় ওর কারবার বন্ধ। ছমাস কাজ কারবার করো, ছমাস বন্ধ। তবু টুক্‌টাক কাজ করে জগন। হাত চালু রাখে। বলে—নইলে মরচে পড়ে যাবে যি গো।

হাটে গঞ্জে তবু মাঝে মাঝে গিয়ে হাজির হয়। দেখ দেখ করে বসে পড়ে। বাবু ভাই গঞ্জের ব্যাপারী ফড়েরা এসে জোটে। কিছু আমদানী হয়, ছুটছাট মেলা খেলায় ও বসে তিনতাস নিয়ে। যা হয় টাকাটা সিকেটা। অবশ্য খেলে সাকরেদরা, সে তদারক করে, তালিম দেয় মাত্র।

বাড়ীতেও মন বসে না আর। খাঁ খাঁ শূন্য বাড়ী। যেন কোন আর আকর্ষণই সেখানে নেই। মাসী টিকে আছে কোনরকমে, সেই হাঁক ডাক দফরফও নেই, কেমন বদলে গেছে।

বুড়ীমাসীরও বয়স হয়ে আসছে। ঈশ্বরদাস মরে যাবার পর থেকে কোথায় যেন মাসী একটা কঠিন আঘাত পেয়েছে মনে হয়। গোড়া কাটা লকলকে লাউলতা যেন অতর্কিত আঘাতে শুকিয়ে কুঁকড়ে বিবর্ণ হয়ে আসছে। গজগজ করে সময় অসময়ে জগনের সামনে।

—আর পারি না জগা, আমাকে রেহাই দে। শেষ বয়সে বাবা কপিলেশ্বরের চরণেই পড়ে 'থাকবো ইবার। আর এই মায়া বন্ধন কেন?

হাসে জগন ওর কথা শুনে।

—বিয়ে থাও করবি না? তা করবি কেনে? কেমন বাপের কেমন ছেলে দেখতে হবে তো?

জগন জবাব দেয় না ওর কথার। দেখেছে বাবার সম্বন্ধে কি যেন একটা অভিযোগ রয়ে গেছে ওই বুড়ীর সারা মনে। ওসব খবর নেবার সময় জগনের নেই। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে আর সেই সব পুরোণো কাসুন্দী ঘেঁটে লাভ কি? বাবার পরিচয় খানিকটা জানে। চুপ করেই থাকে তাই।

বুড়ী গজগজ করে—এই মুলুক জোড়া রাবণের বেড় পড়ুক, মাটির দেওয়াল ভিটে পুরী হোক। আমি দেখতে আসবো না। আমার এ ঝামেলা কেনে রে বাপু?

জগনও মাসীর কথাটা মনে মনে ভেবেছে। নিজেরও মনে হয় একটা কিছু দরকার—যার জন্য অন্ততঃ বাড়ীতে আসবে সে। একজন মানুষের ও আসা দরকার।

...জগন কেমন যেন ভাবে। একটু অন্য ভাবনা। মেলার সেই লাস্যময়ীদের অনেককেই মনে পড়ে। রূপোপজীবিনীদের অনেককেই চেনেজানে সে। মানখাতিরও করে তারা।

কিন্তু সব ছাপিয়ে মনে পড়ে একটি মুখ, দইদে বৈরাগীতলায় মেলায় দেখেছিল এক নজরে। কেমন যেন টলিয়ে দিয়েছিল তার মন।

খেলার কানুনই বদলে ফেলেছিল সে ওই কালো চোখের মায়ায়।

ওই বিকৃতমনা মেয়েদের কেউ সে নয়। একটি সহজ সাধারণ মেয়ে, মেলা দেখতে এসেছিল আরও সকলের মত। কেমন মিষ্টি চেহারা, কঠিন একটি মেয়ে।

দুজনে মেলা দেখতে এসেছিল ভাই বোনেই বোধ হয়। ভাই-এর হঠাৎ কেমন খেয়াল চাপে তাই এসে হাজির হয় খেলার আসরে। ব্যাঙের পুঁজি একটা টাকাই ফেলে দেয় ছকে; এবং তারপর যা হয় তাই হয়েছে। ভোঁ কাট্টা। টাকাটা তুলে নেয় জগন।

টাকা যাওয়ার অতর্কিত ধাক্কায় ছেলেটা কেঁদে ফেলে—আমার টাকা! ওগো ওস্তাদ?

কোনদিকে কোনো বাজে কথায় জবাব দেয় না, দিতে নেই এসময়। জগন আবার দান হাঁকছে—নসীবের খেলা।

মেয়েটিই ফোঁস করে ওঠে—চলে আয় দাদা। দেখছিস না লোকটাকে? কানে যেন কথাই তোলে না। লাট সাহেব নাকি গো তুমি? এই লোকটা?

চমকে উঠলো জগন। এ সুর এ কথা এই আসরে কানে আসে না। বাতাসে কেমন অন্য গন্ধ, এখানের বাতাসে ওঠে যেনো মদের তীব্র টক টক আভাস, কথার সুরে জড়ানো একটা টান। চোখের চাহনিতে জবাফুলের লালিমা।

এ তাদের কেউ নয়, মিষ্টি সুরেলা একটি সুর। পথ ভুলে যেন হঠাৎ ও এসে পড়েছে এইখানে। কি ভেবে টাকাটা বের করে দেয় ওর হাতে।

—যাও এখান থেকে, আর এসো না। মেয়েটা রুখে দাঁড়িয়েছে।

সুন্দর চোখ দুটো তুলে বলে ওঠে—এমনি করে লোক ঠকাও বুঝি তুমি? হ্যাগো?

জবাব দেয়না জগন।

চলে গেল দুজনে। আবার কাজে মন দেয়, সেদিন যেন খেলা

ঠিক জমেনা জগনের, ভুল হয় খেসারৎ দেয় মাঝে মাঝে।

চোখের সামনে ভেসে ওঠে ওই মেয়েটির মিষ্টি চাহনি। কেমন সহজ ভাবেই সত্যি কথাটা বলে চলে গেল বিজয়িনীর মত। কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে জগন, বাতাসে সেই মিষ্টি সৌরভ এখনও যেন লেগে আছে।

—দান যে হেরে গেছগো।

শির সাকরেদকে ছকে বসিয়ে উঠে পড়ে জগন।

মেলায় জনারণ্যে খোঁজ করতে থাকে কাদের; এখান ওখানে, নানা ঠাঁই। কিন্তু কোথায় তারা যেন উবে গেছে হাওয়ায় কর্পূরের মত সেই ছুটী ভাই বোন। অনেক চাষী বৌ মেয়ে এসেছে মেলায়। বাজির ওখানে সার্কাসের সামনে গাড়ী নামিয়ে জটলা করছে তারা। তাদের ভিড়ে খুঁজছে জগন। কে বলে ওঠে—অ পুঁটি, লোকটা কাকে খুঁজছে লো?

মেলার ভীড়ে লোক হারাণো স্বাভাবিক ব্যাপার।

কোন একটি রসিক মেয়ে বলে ওঠে—কে জানে, লোতুন ওর বৌ হারিয়েছে কিনা, শুধো না লো তু?

কথাটা কানে আসে জগনের। থমকে দাঁড়াল একবার! কেমন বিচিত্র একটা অনুভূতি। কি ভেবে আবার অন্যদিকে চলে যায়। মেয়েটিকে খুঁজতে খুঁজতে এইদিকে এসে পড়েছে। মেলার বাইরেব নির্জন অঞ্চল। মেলার আলো এখানে ঘন আমবাগানের ছায়ায় এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। ওদিকে গাছের ডালে থেকে ঝুলছে কয়েকটা হ্যারিকেন। ঢোল কাঁসীর শব্দ শোনা যায়। চারিদিকে ওই প্রায়ান্ধকার পরিবেশ। জীবন্ত প্রেতাত্মার মত দাঁড়িয়ে গোল করে বহু শ্বাপদ লালসা ভরা মন নিয়ে অর্দ্ধোন্মত্ত লোকগুলো, ওদের মত্ত কোলাহল কানে আসে। গান গাইছে সেই সঙ্গে কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী করে নাচছে ঝুমুরি মেয়েগুলো।

—ও কাল জাম ফেলেছে ঠাকুরদিদির বাগানে। এখানে

ওদের দেখা পাওয়া সম্ভব নয়। অন্যদিন জগন এদিকে আসে কি এক বুভুক্ষা নিয়ে, আজ সেই ক্ষুধার চেতনাটুকুও মুছে গেছে সেই অধরকে অন্বেষণের ব্যাকুলতায়।

কে যেন ডাক দেয় তাকে— আরে ওস্তাদ যে, মাঝ আসরে এসো ভাই ?

জগন একটু এড়িয়ে থাকে আজ, ওই স্বল্পালোকে জমায়েত জনতার মুখে কি যেন কদর্যতার চিহ্ন আজ তার কাছে ধরা দিয়েছে।

ঢোলওয়ালা তেহাই দিচ্ছে আশপাশের জনতা ফেবি ধরে দু-এক আনা। ওরা নাচতে নাচতে এসে ওদের কাছ থেকে পয়সাটা নিয়ে যায়; কেউবা অপেক্ষাকৃত ভদ্র ঘরের বখাটে ছেলে ঐ নারকীয় বীভৎসতার সামনে যাবার সাহস নেই, টর্চের আলোর ইসারা করে ডাকে; আবছা অন্ধকারে ডুবায় পয়সা বকশিষের নামে! আজ এগুলো অসহ্য হয়ে উঠেছে তার কাছে।

···থমকে দাঁড়াল জগন! দিনের আলোয় জনহীন সাজ খুলেপড়া মেলার এই জীবনের বাসিন্দাদের দেখেছে সে। কালো চিমড়ে চেহারা কোটরাগত চোখ দুটোয় ধেনো মদের নেশা জড়ানো অলস চাহনি। গায়ের জ্বালা পুকুরের পাঁক জলে স্নান করেও মেটে না। সেই পরম সত্যটা বুঝতে পেরেছে।

পায়ে পায়ে সরে এল জগন এখানে তাদের খোঁজ করতে আসা নিরর্থক। কোথাও তারা নেই— চলে গেছে। বোধ হয় ফিরে গেছে বাড়ীতে।

সেই একটি রাত্রের ছবি আজও ভোলেনি জগন, সব কাজের ফাঁকে মনে পড়ে সেই চাহনি। সুন্দর যৌবনবতী একটি মেয়ের মুখখানা। তার চঞ্চল রক্তপ্রবাহে নোতুন স্বপ্ন আনে কিন্তু কোথায় যেন সে হারিয়ে গেল।

···বুড়ী গজ গজ করে, তিরিক্ষি মেজাজ।

—খেয়ে দেয়ে রেহাই দে আম্মাকে। ঝুলন দেখতে যাবো একটু। ঠাকুর পেন্নামও করতে পাব না!।

জগনেরও কাজ আছে, খেয়ে দেয়ে বের হয়ে পড়ে মাসীকে রেহাই দিয়ে।

বর্ষার সময়, শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা। রূপ যেন উথলে ওঠে চারিদিকে, কয়েক দিন হঠাৎ বৃষ্টিটা থেমে গেছে। গ্রামের চারিদিকে সবুজ পুরুষ্ট ধানের ক্ষেত, নদীর বুকে জলের যৌবন বেগ, বৃষ্টি ধোয়া গাছগাছালির বুকে চাঁদের আলো পড়ে ঝলমল করে: স্বপ্ন আনা রাত্রি।

জগন একমনে চলেছে দলের সাকরেদদের সন্ধানে। কেমন যেন মনে সুর জাগে, চাঁদের আলোমাখা পথে আনমনে চলেছে জগন লোকের ভিড় ঠেলে।

...ফৌত জমিদারদের প্রাধান্য এ গাঁয়ে, এক টাকা ভেঙ্গে ষোল আনির জমিদার, মায় কড়া-গণ্ডায় সরিকানদের ইট খসা ঝুর ঝুরে বাড়ীর বাইরে সেকেলে ঠাকুর দালান। কারোও বা দুপ্রস্থ ঠাকুর বাড়ী, দখলম নাটমন্দিরে পঙ্কের কাজ করা থাম থেকে ঝুলছে ঝেড়ে মুছে নামানো ঝাড় লণ্ঠন, এক এক পাড়ায় এখানে ওখানে কয়েকটা ঠাকুর বাড়ী। ঝুলনের ধুম পড়ে সর্বত্রই।

এ অঞ্চলের মধ্যে পাঁচগাঁয়ের ঝুলন বিখ্যাত। আঠারো পাড়া গাঁ—নিদেন আঠারো দুগুণে ছত্রিশটা ছোট বড় ঠাকুরবাড়ী আছে। প্রসাদ বিলোবার দরকার নেই: অন্য খরচও না করলে চলে, শুধু ঠাকুর সাজানো—দেখো ব্যস। ভিড় ঠেলে গুতোগুঁতি করে সরু দরজা দিয়ে চাঁদের আলোয় মেতে ওঠা রাত্রে বের হয়ে পড়ে আশপাশের গ্রাম এ গ্রামের সব আবালবৃদ্ধ বনিতা। দূরদূরান্ত থেকে যাত্রী আসে। আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে আসে অনেকে দূর গাঁ থেকে ঝুলন দেখতে। যাত্রার আসর বসে। ছোট খাটো মেলাও জমে।

...রায়জী বাড়ীর দো-মহলা ঠাকুর বাড়ীর রকে দোলায় দুলছে

কেষ্ট রাধা সাজবেশ পরে ; থরে থরে সাজানো নানা রকমের পুতুল। বন গাছপালা পাহাড়ও করা হয়েছে। সেই সঙ্গে রবারের পাইপ দিয়ে ঝরণা থেকে জল ঝরছে, সেজের আলোয় রঙ্গীন হয়েওঠে জলধারা। কোথাও ওঠে কীর্তনের সুর।

জগন আনমনে চলেছে, পথটা এখানে নির্জন। ন'তরফের বিরাট বেড়ের বাইরে পথটায় ওদের গোলাবাড়ী, গোশালার ধার দিয়ে চলেছে। এক কালে দফরফ ছিল তা দেখেই বোঝা যায়। এখন গোলাবাড়ী খাঁ খাঁ করছে, গোয়ালও শূণ্যপ্রায়। একপাশে বৃষ্টির জলে গজিয়ে উঠেছে সবুজ কালকাসিন্দে গাছগুলো আর কচুগাছের জটলা। ওদের হলদে ফুলগুলো রাতের আবছা অন্ধকারে চেয়ে আছে।

হঠাৎ কাদের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে ওঠে, দাঁড়িয়ে পড়ে জগন। অতি চেনা এই হাসি, ওই কণ্ঠস্বর। কত দিনরাত্রির কত মুহূর্ত ওরই স্বপ্ন দেখেছে জগন। এখানে সেই মেয়েটিকে দেখবে কল্পনা করেনি। এগিয়ে যায় ওইদিকে।

ভোলেনি সেই কণ্ঠস্বর. হ্যাঁ! তীক্ষ্ণ একাগ্র মন তার ; বাতাসে সে টের পায় আগামী বিপদের, লোকের চোখ দেখে মনের খবর বোঝে. এবারেও ভুল সে করেনি. সেই মেয়েটির দিকে চেয়ে থাকে জগন।

উৎসাহী কণ্ঠে রায়জী বাড়ীর আরও কত ঠাকুর সাজানোর গল্প করছে, কত লোকের ভীড়! একটু অবাক হয়ে গেছে তারা। সেই ভাইবোনেই এসেছে কোন আত্মীয়ের বাড়ী ওদের পাশের গ্রামেই। চিনতে পারে না তারা জগনকে, বাজার পাড়ার কাছে এসে কেরোসিন তেলের ম্লান আভায় মেয়েটা এক নজরে চাইল জগনের দিকে। জগনের বুক কাঁপছে। এতবড় সাহসী পুরুষও কেমন যেন অসহায় বোধ করে। ওদের সঙ্গে সঙ্গে এতখানি পথ এসেছে কি যেন তৃপ্তির স্বপ্নে বিভোর হয়ে।

জগন সরে গেল চুপ করে। মেয়েটিও খেয়াল করে না। ঝুলনের জাঁক জমক আর হৈ চৈ দেখেই খুশিতে ডগমগ করছে সে।

কি যেন অপূর্ব সুরে ভরে উঠে জগনের সারা মন।

লোকের ভিড়ে পথ চলা যায় না। ভলেনটিয়াররা হিমসিম খেয়ে যায় ভিড় সামলাতে, দড়ি দিয়ে মেয়ে পুরুষের পথ আলাদা করা, তবু জলস্রোতের মত জনস্রোত এসে মাঝে মাঝে হানা দেয় এবং চাপে সব যেন ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়।

হাঁপিয়ে ওঠে জগন। এসব যেন ভাল লাগেনা তার। যে তৃপ্তির আনন্দের স্বাদ সে পেয়েছে তাই সে তারিয়ে তারিয়ে একক নির্জনে অনুভব করতে চায়। ভিড় কোলাহল এড়িয়ে চলে আসে বাড়ীর দিকে।

মাসী ক'জায়গায় ঠাকুর দেখে বেশ ভক্তি গদগদ চিত্তেই ফিরছে। জগন আজ রাত্রে কখন ফিরবে কে জানে, হয়তো বন্ধু বান্ধব নিয়ে মদ গিলে সারা রাত কোথায় হল্লা করে সকালে ফিরবে। কিন্তু বাড়ী ফিরে জগনকে দাওয়ায় চাঁদের আলোয় গুম হয়ে বসে থাকতে দেখে একটু চম্‌কে ওঠে মাসী।

—কিরে শরীর খারাপ?

—উহুঁ! জবাব দেয় জগন।

—তবে খেলায় বোধ হয় মোটা দান হেরে এসেছিস? হ্যারে?

মাসীর কণ্ঠে উৎকণ্ঠা। হাসে জগন—না গো না।

—তবে চুপমেরে বসে আছিস যে! মাসীর জেরায় জগন কথাটা বলে ফেলে।

—আজ তাকে দেখলাম গো। ঝুলন দেখতে এসেছে এখানে।

—কেরে?

—ওই যে গো।

ইতিহাসটা প্রকাশ করে জগন মাসীর কাছে।

মাসীর মনে খুশির হাওয়া। রাত নির্জনে কোথায় পাখি ডাকছে,

রাতজাগা পাখী ব্যাকুল স্বরে।

মাসী দাওয়ায় চেপে বসেছে, মন দিয়ে ওর সব কথাগুলো শোনে। জগনের দিকে কি যেন সন্ধানী দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে।

জগনের মনে আশা নিরাশার দোলা। মাসীর দুচোখে কি যেন সন্ধান করছে সে।

সব খবরই এনেছে জোগাড় করে জগন। কোথায় কোন অ আ্ময়ের বাড়ী এসেছে তারা।

মাসী ওর দিকে চেয়ে থাকে। দাঁত পড়া লাল্চে মাড়িতে হাসির ধারালো আভাস। এককালে ওই হাসি বহু মনে ঝড় তুলেছিল। আজ তা বিকৃত একটু খুশি প্রকাশের চেষ্টাতে পরিণত হয়েছে মাত্র। বুড়ীর এখনও মনের জোর এতটুকু কমেনি। হাসতে হাসতে বলে।

—বাপকো বেটা! তাই বলি ছোঁড়া চুপ করে থাকে কেন? তা ঐ যে কোথায় এসেছে বল্লি, মঁাহুনেব যতুর ভাগ্নী? সেখানে এসেছে?

বুড়ী মনে মনে কি ভাবছে।

সকাল বেলাতে চুপ করে কি ভাবছে জগন। রাতের স্মৃতিটা কেমন স্বপ্নের মত মনে হয়। গদাইয়ের ডাকে বিরক্ত হয়েই বাইরে গেল জগন। সাত সকালেই কি ব্যাপার জানে না।

জগন বাইরে চলে গেল চুপ করে। কাল ঝুলোনের মেলাতে বসতে পারেনি নিজে। শির সাকরেদ গদা কামার এসেছে। আজ যদি ওস্তাদ বসে তার জন্য।

বখাটে জমিদার নন্দন অনেক আছে। মদের নেশায় চুর হয়ে তারা আদ্দির গিলে করা পাঞ্জাবী পরে ঘুরে বেড়ায়। গদা কামার বলে উঠে।

—দমের মাথায় এড়ে দেবে এদিক সেদিকে ওস্তাদ। ফাঁকা হাতের বাজী। চোখের তো ঠিক ঠাউর নাই কাপ্তেনদের। যা পারো হাতিয়ে নাও এই সময়।

কি ভাবছে জগন। মাসী বের হয়ে গেছে। খবরটা না পাওয়া পর্যন্ত রোজকার পাতিতে মন আসে না।

চুপ করে বসে থাকে জগন। কাল রাতের কথাটা মনে পাক দেয়। মাসী না ফেরা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারে না। এদিকে রোজকারের ব্যবস্থা করাও দরকার।

গদার কথায় ওর দিকে চেয়ে থাকে।

—কেমন যেন এড়িয়ে যাচ্ছে মাইরী। আজ বসো একবার, ওজকার পাতি তো চাই। হাত যে ফাঁকা, একদম ফরসা।

রোজকার পাতির কথায় জগনের চমক ভাঙ্গে। তারও তো রোজকার এইবার নিয়মিত করতে হবে, এখন যদি দিন বদলায়। এতদিন যেমন তেমন করে চলেছে, এখন কাজ কামাই দিলে অচল হয়ে যাবে। মাথা নাড়ে গদার কথায় জগন। বলে ওঠে সে।

—ঠিক বলেছিস। বসবো আজ। খবর দে তুই।

গদা খুশি হয়ে ওঠে—তাই বল, বুকে ভরসা পাই।

দলের এখান ওখানে খবর হয়ে যায়, খেলুড়ে মহলে ও বাবুদের মাঝে। আজ হবে একহাত, জগনদাস বসবে ছক নিয়ে। ঝুলনের এও একটা আকর্ষণ—সেই নসিবের খেলা; জবর খেলা। লোক জমতে দেরী হবে না। বাবুদের সকলেই জমবে।

জগনের মাসী বাজে কথা বলেনি। বসিয়ে কহিয়ে জাঁহাবাজ মেয়ে। এ চাকলার ঈশ্বরকে যেমন সবাই চেনে, যেমন চেনে সমীহ করে জগনকে, তেমনি মানখাতির করে এড়িয়ে চলে দূর থেকে তার ওই মাসীটিকেও।

কদম ছাট মাথা কাঁচা-পাকা চুলে ভর্তি, আঁটসাট গড়ন। সে রাত্রে জগনের মুখে একটু আভাস পেয়ে তার পেট থেকে সব কথাই বের করে নিয়ে নিজেই পাশের গাঁ মান্দুনেতে গিয়ে হাজির হয়েছে, একবারে চেপে ধরে গোবিন্দ মোড়লকে। যত্ন চেনে জগনের

মাসীকে, একটু অবাক হয়ে ওঠে-।—মাসী যে গো ? তারপর কি মনে করে ?

যদু ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ওঠে, হাজার হোক এদিকের লোকমুখে মাসীর হাঁক ডাক আছে। বিপদে আপদে লোকের উপকার করে, দায়ে অদায়ে পড়ে রাত দুপুরে যাও কড় কড়ে টাকা ও মিলবে। সুদ ! সুদ দিতে হবে বৈকি। তবে তাই দিয়েই বা কে দেয় এ তল্লাটে।

এ হেন মাসীকে বাড়ী আসতে দেখে যদু ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ওঠে। —ওরে আসন দে, ও কুমুদ।

বুড়ী মেয়েটির দিকে চেয়ে থাকে। সদ্য স্নান সেরে একটা নীল ডুরে শাড়ী পরা, ভিজে চুল তখনও বাঁধেনি। একরাশ কোঁকড়ানো ভ্রমর কালো চুলের ডগে একটা গিট বাঁধা।

—প্রণাম কর ওঁকে !

যদু বলবার আগেই কুমুদিনী প্রণাম করে মাসীকে। বুড়ি খুশি হয়ে ওর চিবুক ধরে আদর করে—বেঁচে থাকো বাছা।

মনে ধরেছে কুমুদকে। জগন থাকে ল্যালা খ্যাপার মত, কিন্তু থাকলে কি হবে। জগনের রুচিবোধের প্রশংসা না করে পারে না মাসী। কুমুদ ইতিমধ্যে পান দোক্তাও এনে হাজির করেছে। দাওয়ায় এসে বসেছে কুমুদের মা, যদুর বৌ আরও অনেকেই। তাই তারই মাঝে কথাটা বলে ফেলে মাসী।

—বেশ লক্ষীমন্ত তোমার মেয়ে বাছা। তা আমাকে দাও কেন্নে। জগনের সঙ্গে মানাবে ভালো। আর পাত্র পাত্রী দেখাদেখিও তো হয়ে গেছে কিনা !

মুখ টিপে হাসে বুড়ী কুমুদিনীর দিকে। লজ্জায় অনুরাগে মাথা নামাল কুমুদিনী। ওই হাসিটার অর্থ ঠিক ধরতে পারে না।

যদুর বৌ জগনের মাসিকে চেনে। ওপাড়ার মধ্যে বেশ সম্পদ শালীঘর। খাস জমি জারাত পুকুর বাগান—ঈশ্বরদাস সব কিছুই করে গেছে। লক্ষীআশ্রিত লোক ছিল সে। তাছাড়া মাসীও সে সব আগলে

রেখেছে নিপুন হাতে। জগনের মত পাত্র এ তল্লাটে তাদের বদল ঘরে বিশেষ দেখা যায় না।

কিন্তু এক কলসী দুধে এক ফোটা চোনা পড়ার মত জগনের ওই বৃত্তিটা তার সব শ্রী শালীনতাকে কলঙ্কিত করে তুলেছে। কেমন যেন তাই সবাই দূর থেকে এড়িয়ে চলে তাকে। দৃষ্টির মধ্যেও একটু কিন্তু কিন্তু ভাব।

যদুর বৌ কি ভাবছে।

গোবিন্দর গিন্নি ঠিক মাসীকে চেনে না। তাই বলে ওঠে—কুমুদের বাবা মামারা রয়েছে। তাদের সঙ্গে কথা বলি দিদি। তারপর তারাই নাহয় যাবে আপনার বাড়ীতে কথাবার্তা পাকা করতে। আমার তো দিদি মেয়ের দিকে চেয়ে গলার জল নামে না। ফাঁপালো মেয়ে, কিইবা এমন বয়স। এই ধরো সেবার পটল হল, তার ফিরে বছরই—

বয়সের ফর্দ নিয়ে পড়ে কুমুদের মা।

বেলা পড়ে আসছে। মাসীর রাজ্যের কাজ পড়ে আছে বাড়ীতে। যেদিকে না দেখবে সেই দিকেই বরবাদ। রাখাল বাগাল গুলো গরু পাল থেকে এনে গোয়ালে ছেড়ে দিয়ে যাবে, বাছুরে দুধ খাবে। তবু জগনের সে দিকে নজর নাই। সে বলে—গায়ের দুধ ছায়ে খেয়েছে, ক্ষতি কি? খাক না।

ঘরে ঝাঁট পাট ও পড়বে না। উঠে পড়ে মাসী।

—তাহলে তাই বলিস বৌ। যেচে এসেছিলাম বলে মানে খাটো লই। জগনের বিয়ের জন্য কত সমন্ধ আসছে, জিড়িবিড়ি ধরছে।

যদুর বৌ ওকে চটাতে চায় না, সময় অসময়ে দরকারে আসবে। সেইই বলে ওঠে—কালই যাবে দিদি।

—দেখ বাছা। দেখে শুনে মেয়ে দিবি।

গোবিন্দ মোড়ল কথাটা শুনে একটু চিন্তায় পড়ে। ইতিমধ্যে জগনের বিষয়-আশয় সঁমন্ধে খোঁজ খবর নিয়েছে। তাতে অবাক হয়।

এমন পাত্র তার ক্ষমতায় জুটবে না। কিন্তু চাঁদের কলঙ্কের মত একটা কালোছায়া ওই জগনকে ঘিরে আছে। কেমন যেন বদস্বভাব, জুয়াড়ীর নেশা। ওতে রাতারাতি আমীর আবার ফকীরও হয়ে যায় মানুষ। সর্বনাশা নেশা। মানুষকে পথে বসায়। তেমনি একটি ছেলের হাতে কুমুদকে তুলে দিতে বাধে কোথায়। তার বড় আদরের মেয়ে ওই কুমুদিনী।

মাসীর মনে চিন্তার ছায়া। জগনকে ঘরবাসী করাবে সে। ঈশ্বরদাসকে দেখেছিল, পয়সা সে রোজকার করেছে প্রচুর, সব কিছুই করে গেছে। কিন্তু ওই জুয়ার নেশা তাকে ঘরবসত করতে দেয়নি। অপঘাতে মরেছে আধবেলায়। জগন যদি ওই রক্তে মিশানো নেশা ছাড়তে পারে সুখী হবে। কিন্তু বেবশ মরদকে বশ করতে পারে মেয়েরাই। কুমুদের ওই রূপের আগুনে যদি জগনের বদখেয়াল পুড়ে ছাই হয়, সুখী হবে তারা। মাসীও দেখে যাবে ওদের সুখের সংসার। তাই জগনের বিয়ের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

গোবিন্দ আমতা আমতা করে—সবই ভাল বেয়ান ঠাকরুণ। মানে ওই যে বললাম, বাবাজীর ওই বদখেয়ালটা কেমন ভাল ঠেকছে না।

হাসে বুড়ী—তার জন্য আপনার মেয়েতো আছে। স্বোয়ামীকে শুধরে নেওয়ার ভার তার ওপরেই ছেড়ে দেন। তাছাড়া আজকালকার ছেলেমেয়ের মতিগতি বোঝা ভার। দেখাশোনার বিয়ে, আপনার মেয়েও ডাগর ডোগর হয়েছে। সেও তো সব বুঝেই রাজী হয়েছে বেহাই।

গোবিন্দ কথা বলে না। যদু বরং সাফাই গায়।

—তা বিষয় আশয় বাবাজীর না থাকা নাই। থাক না দোকানপত্র করে। একটা কারকারবার নিয়ে থাক।

মাসী কোট ছাড়ে না, বলে ওঠে—খাঁটি রূপো না খাদ তাই বাজিয়ে লেন। আঙ্গুলেব ডগে টোকা মারেন তবে টং টং বাজবে। সুরেলা বাদ্যি।

মাসী এলেমদার মেয়ে। যেমন করে হোক সাতঘাটের জল এক করে সবার মত করিয়ে বিয়ের কথা পাকাপাকি করে ফেলে কয়েক-দিনের মধ্যেই। জগনের মনে খুশীর আভা। কেমন যেন অন্য সুর জাগে জগনের মনে। মাসীরও সময় নেই, নানা কাজের ঝামেলায় ডুবে গেছে, বিয়ে বলে কথা।

বুড়ির সাদ কিছু অপূর্ণ রাখবে না।

লোকে বলে, ঈশ্বরদাসের বহু জমানো টাকা সোনা দানা মাটির নীচে পোঁতা আছে। অঢেল টাকা। থাক বা না থাক বুড়ি কিন্তু জগনের বিয়েতে বিরাট ব্যাপার করে তোলে। কান্দি, বহরমপুর থেকে বায়না করে আনে চার প্রস্থ বাজনা। ব্যাণ্ড, ব্যাগপাইপ, রোশনচৌকী, ঢোল সানাই। আর বৌভাতে গ্রামের হাঁড়িবন্ধ ভোজের আয়োজন করেছে। সারা পাড়া যেন আলোয় আর বাজনার সুরে ভরে উঠেছে। ভিয়ান বসেছে দুদিন আগে থেকে। ঘিয়ের পোড়া গন্ধে বাতাস ভরপুর।

কনেকে জিনিষপত্রও দিয়েছে তেমনি। গায়েহলুদের তত্ত্বই দেখবার বস্তু। চারপাঁচটা লোক বয়ে নিয়ে যায়—পুকুর থেকে ধরানো সব থেকে বড় একটা আধমণটাক মাছকে সিঁদুরে রাঙ্গিয়ে তুলেছে।

শাড়ী, রকমারী শাড়ী। বেশ কয়েকপদ মোটা জমাদার গহনাও দিয়েছে; গহনায় মুড়ে দিয়েছে কুমুদকে।

পাড়াপড়শীর কাছে এযেন রীতিমত ঈর্ষার বস্তু, আলোচনার সামগ্রী হয়ে উঠেছে। কুমুদ এত জিনিষ চোখে দেখেনি। সাধারণ চাষীবাসীর খাটিয়ে ঘর, মোটামুটি অবস্থা।

আজ গোবিন্দ মোড়লও অবাক হয়ে গেছে এসব এলাহি ব্যাপার দেখে।

—রাজরাণী হবে তোমার মেয়ে ছোট বউ। কুমুদের আমার ভাগ্যি আছে, নইলে এমনি বর যেচে আসে।

কলরব কোলাহল আর আলোর মধ্যে জগন দেখে কুমুদকে। এ যেন অন্য কোন এক মহিমাময়ী নারী, যাকে এর আগে কোনদিন দেখেনি, চেনেনি। কুমুদও অবাক হয়ে চেয়ে থাকে জগনের দিকে।

ওর দুচোখে কিসের সন্ধান করে--মাথা নামাল কুমুদ।

শাঁখ বাজছে এক সঙ্গে, উলুধ্বনির মধ্যে ওরা যেন অন্য জগতের দিকে চলেছে, যেখানে প্রত্যহের মালিন্য নেই। আছে তৃপ্তির অফুরাণ প্রবাহ।

মাসী আজ খুশীতে উপছে পড়ে। সেই সঙ্গে মনের কোণে দেখা দেয় চাপা একটা বেদনা, দুঃখ। ঈশ্বরদাস এসব দেখে গেল না।

দেখতে পায় নি তার বোন। নিজের ছেলের বৌ—তার সংসার শান্তি--কিছুই দেখে গেল না সে। ঈশ্বরদাস ও মরেছে।

আজ এই সুখের দিনে সেই কথাটাই মনে পড়ে মাসীর বার বার, তবু জগন সুখী হোক, ঘর-বসত করুক, এই কামনা করে আজ বুড়ী।

বৌ দেখে প্রশংসা করে সবাই। যেমনি নিখুঁত সুন্দরী তেমনি দেওয়া থোওয়াও পেয়েছে, ভাগ্যমন্ত বৌ।

জগনের মাসী বলে—এই আশীর্বাদই কর দিদি। সুখী হোক, বেঁচে বর্তে থাক শান্তিতে। তোমরা সেই আশীর্বাদই করো।

বৌভাতের ব্যাপারে হিমসিম খেয়ে যায় জগন। নারদের নেমন্তন্ন করেছে মাসী। চাল ফুটছেই পাতা পড়ছেই। অগুনতি নেমতন্ন। মাসী আজ দিলদরিয়া।

অন্য সময়ে মাসীর হাত দিয়ে জল গলে না, হাড় কেপ্পন। আজ মাসীর এই পরিবর্তনে নিজেই বিস্মিত হয়েছে জগন। এতটা বাড়াবাড়ি খরচ করাটা তার কেমন যেন ভাল লাগে না। প্রতিবাদ করবার সাহস নেই। মাসী আজকের দিনেই কুরুক্ষেত্র বাধাবে। তাই আড়ালে চুপিচুপি হাসতে হাসতে কথাটা মাসীকে না বলে পারে না।

—এত খরচ করছো মাসী?

জগনের কথায় মাসী বলে ওঠে—হ্যাঁ। আমার সাধ আহ্লাদ নাই? কি করিয়েছিল তুর বাপ? তীর্থ ধর্ম? আবার তুইও তো সব করালি? ছুটো পাতা পড়বে বাড়ীতে একটা কাজ কম্মে, তাও দিবি না?

এরপর আর কথা বলেনি জগন।

বিশ্রাম পায় রাত্রি গভীরে। ক্লান্তি আর অবসাদে দেহ ভেঙ্গে আসছে। ফুলশয্যার রাত্রি। লোকের মুখে অনেক কথাই শুনেছে। শির সাগরেদ গদা কামার কয়েক বছর আগে বিয়ে করেছে।

সেই শিখিয়ে দেয়—পয়লা রাতেই মরদের মত গর্জাবে আর হাঁকড়িও লাগাবে ওস্তাদ, যেন মাগী ডরিয়ে কাঁটা হয়ে যায়, একবার ডর ধরাতে পারলেই ব্যস, বাজী মাৎ। যা ইচ্ছে কবো টুঁ টি করবে না ভবিষ্যতে। মরদকে ডরিয়ে থাকবে। লইলে কিন্তু বৌএর গর্জানিও শুনতে হবে চেরকাল। একবার ডর লাগিয়ে দিলেই ব্যস।

জগনের চোখের সামনে ভেসে ওঠে অতীতের একটি রাত্রের ঘটনা। মেলার আলো ঝলমল পরিবেশ, মাথা তুলে মেয়েটি গর্জাচ্ছে বিজয়িনীর মত—কানে কালা না লাট সাহেব গো তুমি। কথা কি শুনতেই পেছ না?

নিটোল কচি পুরুষ্ট সবুজ গাছের মত সুঠাম গড়ন মেয়েটির। ওর কথায় চমকে উঠেছিল জগন। ঝড় উঠেছিল তার মনে।

জানালার ফাঁক দিয়ে এক ফালি আলো এসে পড়েছে। ওদিকে জ্বলছে বড় প্রদীপের ম্লান আলো, ঘরে ফুলের চাপা সৌরভ, শাড়ীর খস্ খস্ একটু শব্দ। কেমন যেন অচেনা একটা পরিবেশে এসে পড়েছে জগন। সেই মেলার হাজার জনতার সামনে অটুট ব্যক্তিত্ব কেমন যেন প্রায়ান্ধকার ঘরের বিচিত্র এই পরিবেশে ওই একজোড়া চোখের স্থির তির্য্যক দৃষ্টির সামনে হারিয়ে যায় নিঃশেষে। অসহায় বোধ করে নিজেকে।

মাথা নীচু করে হাসছে কুমুদ। হালকা ঠোঁটে হাসির ম্লান আভা

কেমন রঙ্গীন স্বপ্ন আনে। সেইই আহ্বান জানায় তাকে।

—এসো! দাঁড়িয়ে রইলে যে।

সাদর আহ্বান। জগন যেন কি এক নতুন জগতের স্বপ্ন দেখে ওর চোখে; সব ভুলে যাওয়ার স্বপ্ন, তৃপ্তির আর পূর্ণতার অসীমে হারিয়ে গেছে সে। বিচিত্র এ জগৎ, সব. চেয়ে বড় পাওয়া জেতার আনন্দময় এই অনুভূতি। মনে মনে আজ তৃপ্ত হয়েছে জগন।

নতুন করে দেখতে শেখে সে কুমুদকে। শুধু কুমুদকেই নয়, তার চারিদিকের পৃথিবীকে, এ যেন তার অন্তর্দৃষ্টি। চেতনার নব প্রত্যুষবেলা।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। পাখী ডাকা ভোর—জগন যেন কেমন বদলে গেছে, স্থির চোখে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। প্রভাতের এই সদ্যস্নাত সূর্যের প্রথম আগমনী আলোকটুকু আগে কোনদিন এই চোখে দেখেনি।

মনে একটা চমক লেগেছে ভাঙ্গা গড়ার সুর উঠেছে সারা মনে। সকালের আলো দেখে, পাখীর ডাক শুনে তাই থমকে দাঁড়াল জগন।

চাষীবাষী ঘরের কাজের মেয়ে, পটের বিবির মত বসে থাকার অভ্যেস তার নেই। চোপায় খোঁপায় মেয়ে কুমুদিনী। বাপের বাড়ীতে থাকতে সংসারের সব কাজ কর্ম, ভাজ-ভাইপোদের ঠ্যালা সামলাতো, গরু বাছুরকে জাবনা দিত, মাঠ থেকে খেটে খুটে দাদা বাবা ফিরলে তাদের পরিচর্যা করত, গুড় জল থেকে স্নানের তেল গামছাটা পর্যন্ত হাতের কাছে এগিয়ে দিত, নীরব সেবা আর মাধুর্য দিয়ে বাপের বাড়ীর শান্ত পরিবেশটুকু ভরে তুলেছিল।

সেই স্বভাবজাত অভ্যাসটা আজও ছাড়তে পারেনি কুমুদিন। ক দিনের মধ্যেই নতুন বৌ এ সংসারের সব কাজ কর্মই হাতে তুলে নিয়েছে। রাখালবাগাল, মুনিষ মাহিন্দারের দেখাশোনা, গোয়ালে রোজ দুবেলা গরুর জাবনা, খোল ছানি ঠিকমত রাখালে দিল কিনা, দুধের গাই এর বাচ্চাটাকে সময় মত বাঁধা, দুধ দোয়ানোর ব্যবস্থা

করা, ওদিকে মরাই থেকে রাশিরাশি ধান বের করা হয়েছে, চাল তৈরী করার জন্য ভানারীকে দিতে হবে মাপ করে, সবই দেখে সে।

গাছকোমর করে কাঠের পাই হাতে এগিয়ে যায় কুমুদিনী। বাধা দেয় মাসী—ওলো অ কুমুদ, তুই কি করবি লা?

হাসে কুমুদ—কেন, আমি কত কাল বাপের বাড়ীতে মাপধরুণে ধান মেপেছি; এ আর পারবো না! সর দিকি মাসী।

ভানারী বেনেবৌও অবাক হয়ে যায় কুমুদের কাজ দেখে।

জগন বাজার করে বাড়ী ফিরছে। এসব কাজ সে বড় একটা করতো না। শুতো রাত দুপুরে, না হয় ভোরের দিকে, নানা ঝামেলা থেকে এসে। ঘুমুতো অনেক বেলা অবধি, মাসী গজগজ করতো।

—বলি হ্যাঁরে, তরকারী পত্তো না আনলে আমি রাঁধবো কি? ঘুম চোখে জবাব দিত জগন—ওই আলু, কুমড়ো, পেঁয়াজ আছে জমির, ওই দিয়ে যা হয় করো। আর বাজারে যেতে পারবো না বাপু, গতরটা মাটিমাটি করছে।

মাসীও মুখঝামটা দেয়—তা করবে না কেনে? চোপ্পরাত যে ওই সব ছাই পাঁশ গিলছিস রে মুখপোড়া।

জগন বেগতিক দেখে মাসীর সামনে থেকে আস্তে আস্তে সরে পড়তো। এই ছিল তখনকার প্রায় রোজকার ঘটনা।

আজ মাসীই একটু অবাক হয়ে গেছে জগনের এই পরিবর্তন দেখে, সকাল সকাল ওঠে ঘুম থেকে। মুখ হাত ধুয়ে বাজারের দিকে যায়, বলতে হয় না। মনেমনে খুশী হয়েছে বুড়ী; কুমুদিনীই তার সংসারের রূপ বদলেছে।

জগন বাজারের ধামা দাওয়াতে নামিয়ে ওদিকে চেয়ে থাকে। বাতাসে উড়ছে ধানের ধুলো, উঠোনে মরাই থেকে মুনিষে বের করেছে একরাশ সোনা ধানের স্তূপ। তারই একপাশে বসে গাছকোমর করে কুমুদ ধান মেপে দিচ্ছে ভানারীকে। অভ্যস্ত কয়ালের মত মুখেমুখে হিসাব রাখছে দুই এ দুই। তিন এ তিন। চার এ চার।

সুগৌর মুখে লেগেছে ঘামভেজা ধানের ধুলো, কুমুদ জগনের দিকে এক নজর চাইল ডাগর চোখের আয়ত চাহনি মেলে! কাপড়-খানা কোমরে জড়ানো, আঁচলটা খুলে মাথায় দেবার চেষ্টা করে।

জগন অবাক হয়ে দেখছে ওই রহস্যময়ী কুমুদকে।

মাসী ব্যাপারটা দেখেছে, একটু কৃত্রিম কঠোর সুরেই বলে ওঠে, —হ্যাঁরে জগা। তোর কি কাজ কম্মো নাই? বাজার আনলি, বললাম বিধু ঘোষকে টাকার জন্যে একবার তাগাদা দিয়ে আয়।

জগন অনিচ্ছা সত্ত্বেও বের হয়ে গেল বাড়ী থেকে।

হাসি চেপে কুমুদ আবার সহজ স্বাভাবিক সুরে ধান মাপতে থাকে —চার এ চার। পাঁচ।

মাসী যেন বৃদ্ধ বয়সে সংসারের কঠিন ঘানি টানা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। কুমুদই ওর হাত থেকে কাজগুলো টেনে নেয়।

—আমাকে দাও মাসী।

কুমুদ বিরামহীন গতিতে কাজ করে চলেছে।

মাসীর মুখে বৌএর গল্প আর ধরে না। পাড়াপড়শীর কাছে গল্প করে।

—খাসা বৌ বাছা।

দত্তদের সেজবৌ বলে ওঠে—

আগে পুতকে রেখে মরি
তবে পুতের গৌরব করি।

কে যেন বলে—প্রেথম প্রেথম অনেকেই মন নেবার জন্যে ওসব করে, তারপর একবার হাতে পেলে তখন ভাবে, এ বালাই আর ঘরে কেন? আজকালকার মেয়ে সব শিখেই আসে।

মাসীর কথাটা ঠিক মনঃপুত হয় না। কত বৌ দেখেছে, কই তার কুমুদের মত আর কেউ এসেছে? দুপুরে দত্তদের বাড়ীতে মহাভারত পড়ার আসর কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে মাসীর কাছে।

কুমুদ হাত থেকে কাজ টেনে নিয়ে করে! বলে—তুমি একটু মালাই জপ করো মাসী। ভারিতো কাজ, ও আমি করছি।

জগনই যেন একটু বিপদে পড়েছে। মাসীও বদলাচ্ছে এইবার। এতদিন বাড়ী ফেরার কোন সময় ক্ষণ ছিল না। সন্ধ্যাবেলায় বের হতো, কাজকর্ম না থাকলেও এপাড়া ওপাড়ায় সাকরেদদের ওখানে আড্ডা দিয়ে কাটাতো! ফেরা না ফেরার কোন সময় ছিল না। মাসীও দীর্ঘ দিন ধরে দেখে আসছে এবাড়ীর রীতি নীতি। ঈশ্বরদাস ফিরতো কখন, যেতো কখন তার হদিসই পেতনা, বাপের সেই পাট পেয়েছিল ছেলেও। তাদের আসা যাওয়ার রাতের তারার মতই কোন ঠিক-ঠিকানা বিহীন।

জগন সেই ধাতেই গড়া, রাতের আবছা অন্ধকারে ফিরতো। কিন্তু প্রথম কুমুদই প্রতিবাদ করে কয়েকদিন পর।

—সকাল সকাল ফিরতে পারো না কি করো এত রাত অবধি? কোথায় বা থাকো?

কেমন খটকা লাগে জগনের মনে। কুমুদের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে জগন—কেন?

কি যেন একটা অদ্ভুত কথা বলেছে কুমুদ। চমকে উঠেছে তাই জগন। এ বাড়ীর সুরে ওর কথা মেলে না, তাই অবাক হয়েছিল জগন।

কুমুদ বলে ওঠে—এত রাত অবধি ভাত আগলে বসে থাকতে ভালো লাগে না।

—কাজ থাকে যে! জগন বলবার চেষ্টা করে কণ্ঠস্বর কঠিন করে কুমুদকে ধমকাবার চেষ্টা করে, যেন গদাই-এর কথামত। ঠিকই বলে-ছিল সে; কদিন একটু বেশী লাই দিয়েছে কুমুদকে। ও সব কড়া কথা-বার্তা ধমক কিছুই পড়েনি। ভাল মানুষের মতই রয়ে গেছে। কিন্তু আজ কথাবার্তা শুনে কুমুদ মনে মনে চটে উঠেছে।

মর্দানি না দেখালে মেয়ে লোক মাথায় চাপবে। লাই দিয়েছো

কি ব্যস ? পেয়ে বসবে একেবারে।

কিন্তু কুমুদের দিকে চেয়ে থাকে। দু চোখ ছলছল। ভিজে গলায় যেন ব্যাকুলভাবে বলে ওঠে ছোট ওই মেয়েটি—একা একা ভয় করে আমার। রাত হয়ে ওঠে চারিদিক নিশুতি, খুব ভয় করে গো।

—ভয় ! জগন তাকে কাছে টেনে নিয়ে অভয় দেবার চেষ্টা করে। অজানা ভয়ে যেন কাঁপছে কুমুদ।

জগন রীতিমত বিপদে পড়ে—আঃ, কাঁদছ কেন ? কাঁদবার কি আছে ?

তবু বাধা মানে না, কুমুদ কাঁদছে ফুপিয়ে ফুপিয়ে ! জগন নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে করে। এমন কান্নাকাটি থামানো তার কাছে ঝকমারি।

পাড়ার আরও পাঁচজন বৌ ঝিদের সঙ্গে ক্রমশঃ আলাপ পরিচয় হয়েছে তার। চৌধুরীদের দুআনিব তরফের মস্ত পাঁচীল ঘেরা পুকুরের ঘাটে জমে তাদের স্নানের ভিড়। মেয়েদের ঘাট আলাদা, বেশ পাঁচিল ঘেরা ; আব্রুব ব্যবস্থাও আছে। সেখানে স্নান করতে গিয়ে অনেক বৌ ঝিই বিস্মিত দৃষ্টিতে কুমুদকে প্রথম প্রথম দেখে, অনেকেই দূর থেকে চেয়ে থাকে। নতুন বৌ ! মুখুয্যের ছোট বৌও নতুন এসেছে। সেইই এগিয়ে এসে আলাপ করে, ক্রমশঃ বাপের বাড়ির কথা থেকে এখানের কথায় ফিরে আসে তারা। কুমুদের চুড়ি হারের দিকে চেয়ে থাকে অনেকেই। ওদের চাহনিতে কি একটা কৌতূহল, নীরব প্রশ্ন মাখানো। কেমন যেন দূর থেকে ওরা সকলেই এড়িয়ে চলে তাকে। এটা বেশ বুঝতে পারে কুমুদ, নিজেরই লজ্জা করে, দুস্তর লজ্জা। এটা যেন কেমন করে অনুভব করে কুমুদ, তাদের স্বাচ্ছল্যকে হিংসা করে ওরা।

কিন্তু ভালবাসে না, কেমন তাই বোধ হয় এড়িয়ে থাকতে চায় ওরা। আড়ালে নানা রকম মন্তব্য করে। গা জ্বালা করা নানা কথাও

বলে তারা।

সেদিন কুমুদের কানে আসে কথাটা। কি যেন ইঙ্গিতপূর্ণ সেই কথাটার গহনা গাঁটির প্রসঙ্গে।

—ওসব যে পথে এসেছে সেই পথেই যাবে বাছা একদিন। জগন জুয়াড়ীকে চেন না, দেবে কোনদিন জুয়োর ছকে এড়ে, ভোঁ কাট্টা করে। ও আর কদিন, দেখনা বাছা।

দত্ত বাড়ীর বৌ বলে ওঠে—উহু, নতুন বৌও টাটোয়ার মেয়ে। হাতে তুলে দিলে তো?

জবাব দেয় সেই মেয়েটি।

—না দিলে ঘা দুমা-দুম পড়বে। বাপকো বেটা। ওর বাপ ঈশ্বর কি করেছিল জানিস না, ওই জুয়াড়ীর হাতে ধুমসানি খেয়ে ওব বৌ, অমন লক্ষী মেয়েটা অকালে মরলো! কি মার মারত বাছাকে—আহা! পাষাণ লোকটা, তারই ব্যাটাতো ওই জগন, দৈত্যি হতচ্ছাড়া।

কুমুদ গলাজলে গা ডুবিয়ে কথাগুলো শুনে চলেছে; সারা দেহের অসহ্য জ্বালা ওই জলেব হিম ছোঁয়াতেও যেন যায় না। দত্ত বাড়ীর বৌএর তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। সব গেছে, স্বামী ধুকছে! তবু বড়াই করতে ছাড়ে না—তার মত পাকা চুলে সিঁদুব পববাব ভাগ্য কজনের আছে। অর্থাৎ সীতা সাবিত্রীর পরই বোধ হয় তার স্থান সতীত্বের খাতায় মোটা করে লেখা।

বলে ওঠে মেয়েটা—তা নয় গো, ঈশ্ববদাসের বার টান ছিল। ওই যে গো ঘরেই রয়েছেন উনি! যত নাটের গুরু সেই তিনিই। মিনসে কোত্থেকে ওকে বের করে আনে, ঘরে তোলে মানখাতির করে। হাজার হোক ঘরের বৌ—সে সইবে কেন? খিটিমিটি লাগতো, মিনসে রাতের বেলায় নাকি—বাকিটা ইসারায় প্রকাশ করে দত্ত বৌ।

কুমুদ দাঁড়াল না, ওদের সামনে দিয়েই ভিজে কাপড় কোন-রকমে গায়ে জড়িয়ে কলসীটায় জল ভরে নিয়ে উঠে গেল। সকালের সোনারোদ কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে উঠেছে কুমুদের সামনে। যে আশা

আনন্দ নিয়ে এসেছিল প্রথম ঘর করতে, সেই আনন্দের জগতে কেমন একটা কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। ওদের নানা কথা আলোচনায় মন গুমরে ওঠে অসহায় বেদনায়।

দত্ত বৌএর দু চোখে একটা চাপা বিরক্তি—মরণ দেখনা, রূপ না হয়ঃতোর আছে, তাই বলে ঘাটে পথে জাহির করতে হবে এমনি করে?

মুখুয্যেদের ছোট বৌ মালতী আগাগোড়াই ঘটনা আর ওই দত্ত গিন্নীর কথাগুলো শুনেছে। মড়ারও চেতনা ফিরে আসবে ওই হাঁড়-জ্বালা করা কথায়। মালতী কি জবাব দিতে গিয়ে থামল। ওতে কথা আরও বেড়ে যাবে এই ভয়ে।

দত্তগিন্নী ইতিমধ্যে কয়েকটা ডুব দিয়ে জোরে জোরে ইষ্টমন্ত্র আওড়াতে সুরু করেছেন। পাপের একটু ছোঁয়া হয়তো লেগেছিল, কোন ক্রমে সেটাকে মন্ত্রের তেজে তাড়িয়ে আবার শুদ্ধচিত্রে অন্য কার নামে পরচর্চা সুরু করবে। নিন্দা করতে গেলেও শুচিস্নাত হওয়া দরকার। নইলে নিন্দাটা বোধ হয় বেশ তেজালো হয় না।

চোখ খুলে হঠাৎ দাবড়ে ওঠে দত্ত বৌ—এ্যাই, ডবর ডবর করে জল ছিটুচ্ছিস কেনে লা?

একটা বাচ্চা মেয়ে পরম উৎসাহে ঘাটলার ধারে সাঁতার শিখছিল। তার উদ্দেশ্যে কথাটা বলে আবার চোখ বোঁজে দত্তগিন্নী। বেপরোয়া মেয়েটাও একরাশ চুল দুহাতে সাপটে বেঁধে ওর কথায় কান না দিয়ে অবার নতুন উদ্যমে দু পা দিয়ে জল ছিটতে থাকে। কে কার কথা শোনে। ওকে শাসাবার মত কেচ্ছা কেলেঙ্কারীর কোন অস্ত্র দত্তগিন্নীর তূণে নেই। আর সাঁতারু মেয়েটির এসব চেতনা বোধও নেই, ঘাটের আর সবাই উঠে গেছে যে কাউকে নিয়ে পড়বে। বাধ্য হয়ে একাই গজ গজ করে তাই উঠে গেল দত্তগিন্নী।

মাসী বড়ি দিচ্ছিল দাওয়ায়, কুমুদকে স্নান করে ম্লানমুখে বাড়ী ফিরতে দেখে একটু চেয়ে থাকে তার দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে। ব্যাপার খানিকটা অনুমান করে বুড়ী। ও জানে এখানকার হালচাল।

কুমুদ চুপ চাপ বাড়ী ফিরে কলসীটা নামিয়ে কাপড় ছাড়তে ঘরে ঢোকে। ওদের কথাগুলো তখনও ভুলতে পারে না; ও সবকিছু সত্য হয়তো নয়, তবে ঈশ্বরদাসের জুয়ার ব্যবসা আর জগনেরও রোজকারের পথ সেই-ই, এটা যে প্রশংসার নয় তা নিজে জানে ও বোঝে। লোক ঠকানো—ঠকানো শুধু নয় চুরি করাই। জুয়াড়ীর বৌ—তার আবার সম্মান। নিজের উপর কেমন ঘৃণা আসে। বিজাতীয় ঘৃণা। জগনকে ভাল লাগে তার: বলিষ্ঠ চেহারা—তেমনি দরাজ মন। প্রথম নজরেই ওকে ভাল লেগেছিল কুমুদের। তা ছাড়া মনে হয় ও ভালবাসতেও জানে—নইলে ক'মাস ফিরেছে তার পিছনে। ওর উদ্দাম কামনার উষ্ণতা ভুলতে পারে না কুমুদ। তবু কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গেছে তার মনে। জগনকে ঠিক যেন পায়নি নিঃশেষে।

ওদের কথাগুলো এখনও মনে পাক দিচ্ছে উষ্ণ তীব্র জ্বালাময় একটা অনুভূতির মত; তীক্ষ্ণ কথাগুলো মনের সব শ্রী কুশ্রী করে তুলেছে।

মাসীর ডাক শুনে চমকে ওঠে—কি করছিস লা কুমুদ। অ-কুমুদ। ভিখেরী নাগাড়ি আসছে ছুমুঠো দেনা বাছা, আমার যে বাসি কাপড়।

—যাই মাসী। মাসীর ডাকে সাড়া দিয়ে তাড়াতাড়ি বের হয়ে আসে ভিক্ষার সরাটা হাতে নিয়ে।

ভিখারী আসবেই এ বাড়ীতে। এবাড়ীর রেওয়াজটা মাসী চালু রেখেছে। একদিক দিয়ে লোককে ঠকিয়ে আনে পয়সা, কিন্তু অন্যদিকে মাসী সেটা খানিকটা পুষিয়ে দেয়। অতিথি ফকিরের তাই ছাড়ান নেই। এদিক ওদিকে অনেক বাজে ধারও দেয়। মাসী জানে, সে ধার কোনদিনই শোধ হবেনা, তবু বেচারার উপকার সে করে।

কুমুদ ভিক্ষা দিয়ে ঘরে যাচ্ছে। মাসীর নজর চারিদিকে, তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি ওর। একলা পেয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে কুমুদকে —কি হয়েছে লা? কাঁদছিলি মনে হচ্ছে?

কুমুদ জানে এখুনি কিছু বললেই মাসী রণমূর্তি ধরে পাড়ায় বেরুবে, তার ধারাল জিবের ভাঁজ করা নিটোল কথার সামনে দাঁড়াবার যোগ্যতা কারও নেই। শুধু কেচ্ছা কেলেঙ্কারীর ভয়েই চেপে যায় অপ্রিয় ব্যাপারটা। জবাব দেয়—কই না! শরীরটা ভাল ঠেকছে না মাসী।

মাসী উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে—আর তাই সাত সকালে ডুব দিয়ে এলি? বলি বুড়ীর হাড় না জ্বালিয়ে তোরা থামবি না? কই গা দেখি?

কুমুদের মিথ্যা কথা যেন খানিকটা ধরা পড়ে যায়। মাসী ওর দিকে চেয়ে বলে উঠে—কেউ কিছু বলেছে তোকে?

—উহুঁ। কুমুদ জবাব দেয়।

তবু কৈফিয়ৎটা ঠিক মনঃপুত হয় না মাসীর। গজরাতে থাকে। —ওদের সবাইকে চিনি আমি। দোব কোনদিন ধুড়-ধুড়ি নেড়ে। সর্বাঙ্গে ওদের পোড়া ঘা। আমি না জানি কি? হাটে হাড়ি ভেঙ্গে দেবো।

কুমুদের হাসি আসে এত দুঃখেও। হাসি চেপে গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে আঁচ দিতে থাকে উনুনে।

পূজোর সময় পাঁচ গাঁ জমে ওঠে। ভাঙ্গা পুরোণো বাড়ীর এদিকে ওদিকে পূজো। সারা গাঁয়ে অন্ততঃ চল্লিশখানা পূজো আছে। ছ' আনির জমিদার বাবুরা এখনও টিম টিম করছে। বাবুদের বাড়ীর ছেলেরা অনেকেই জমিদারীর আদায় উসুলের ভরসা ছেড়ে চাকরী নিয়েছে। তারাও সবাই গ্রামে ফেরে। নদীর ঘাটে জমে নৌকার ভীড়।

এদল ওদল বাড়ী ফিরছে চাকরী থেকে কয়েকদিনের ছুটিতে। তাদের কলরব আর মেয়েছেলেদের ঝলমল শাড়ী পোষাকে অর্দ্ধমৃত গ্রামখানা জেগে ওঠে।

ঢাকের শব্দ ওঠে, নদী বিলের বুকে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলে। বালির চরে যতদূর চোখ যায় কাশের সাদা উত্তরী, মাঝে মাঝে দুধ আকন্দের ফুলের স্তবকগুলোকে ঘিরে কালো ভ্রমরের গুঞ্জন। নদীর গেরুয়া জলও কালো হয়ে আসে। বাতাসে হিমের হালকা ছোঁয়া।

রাস্তাঘাটের ঘাস চাঁছা-ছোলা হচ্ছে, নারকেল বাগানের বেগড়ো পাতা কামিয়ে ঝুনো নারকেলের নিটোল কাঁদিগুলো নামানো হয়। বাড়ী বাড়ী দেওয়াল নিকোনো, দরজায় রং করা, নানা আলপনা আঁকার ধুম পড়ে যায়।

কুমুদের নাম ইতিমধ্যে পাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে—এমন পদ্ম আর আলপনা আঁকতে কোন বউই পারে না। সারা পাড়ায় বহু বিভিন্ন জায়গা থেকে বৌ এসেছে। তারা সঙ্গে এনেছে তাদের বাপের বাড়ী অঞ্চলের গ্রামীন শিল্প শৈলী।

. কুমুদের হাতের কাজও বেশ চমৎকার। আলপনা দিতে ডাক পড়ে এ বাড়ী সে বাড়ী।

জগনও খানিকটা ধাতস্থ ছিল এতদিন, পুজোর মরসুমের চালু বাজারে তাকেও বেরুতে হয় রোজকারের ধান্দায়। বসে থাকবার পাত্র সে নয়। সহরের বাজারে হাটের পাশে বসে ছক নিয়ে। পুজোর বাজারে মাল গস্ত করতে আসে নানা জায়গার ব্যাপারী। ওদের কোমরের ময়লা গেঁজিয়ার মধ্যে গজ গজ করছে তাড়া বন্দি নোটগুলো; তারাই জগনের শিকার, জব্বর শিকার। কোন রকমে ভুলিয়ে ভালিয়ে এনে হাজির করে সাকরেদ গদা কামার আরও দুচার জন। দু-একদান জিতিয়ে দিয়ে তারপরই মোক্ষম আঘাত হানে নিপুণ হাতে জগন নিজে। মোটা দানের মাথায় ঘুঁটি উল্টে যায়। ব্যস, কয়েকশো টাকাই ভোঁ কাট্টা।

লোকসানের ধাক্কা সামলাবার আগেই তারা উধাও হয়ে যায়। আর থাকেনা সেখানে। ওদের ছুটকো খেলার এই রীতি। এক জায়-গায় বসবেনা বেশীক্ষণ, পুলিশের হাঙ্গামা আছে—তারপর আছে

ক্ষৌত হবার ভয়।

এসব শিক্ষা এবিদ্যার প্রথম কথা, বাবার কাছ থেকে এগুলো পেয়েছে—তারপর নিজেও এবিদ্যাকে আরও রপ্ত করে তুলেছে নানা ভাবে, নানা সাধনায়। তবু আজও বাবার জীবনে সেই শেষরাতের ভুলটা তার কাছে চরম শিক্ষা হয়ে আছে। সেই ভুল আর করবে না।

সে দিনকয়েক হাটে বেশ দাও বসিয়েছে। গদা কামারই বলে ওঠে—অনেকদিন পেসাদ টেসাদ পাইনি ওস্তাদ, হোকনা একটু। আজতো আমদানী মন্দ হয়নি।

সায় দেয় আরও দু-একজন। কি ভাবছে জগন। দোটানায় পড়েছে সে। একদিকে তার ঘর সংসার কুমুদ। অন্য দিকে এই রোজকারের বন্ধু সহকারী দল। ওদের চাই, চটানো চলবে না। দল ছেড়ে নিজেরা বের হয়ে গিয়ে দল ফাঁদলে তার ভাতেই হাত দেবে। তাদের ফেলতে পারেনা। অনেক ভেবে চিন্তে বলে ওঠে জগন—চল, কিন্তু আমি খাব না। তোরা খাবি।

হাসে গদাই—বুঝেছি ওস্তাদ? বলেছিলাম না, বিয়ের পয়লা রাতেই বাগ দেখাতে হবে, তা দেখাওনি নির্ঘাৎ! এইবার মাথায় চেপে বসেছে। মেয়ে জাত চেন না - ধমকাও পেটাও—ল্যাজনাড়বে। আদর করেছো কি অমনি মাথায় উঠেছে। কি ঝকমারি করেছো বলো দিকিন? ছ্যা ছ্যা, হাজার ঝকমারি, এখন লাও, সামলাও ইবার।

হাসে জগন—ধ্যাৎ। কেঁচো হয়ে আছে দেখগে ঘরে। ডরিয়ে কাঠ হয়ে যায় হাঁক ছাড়লে।

—তবে আর এক যাত্তায় পেরথক ফল কেনে ওস্তাদ? হয়ে যাক দু এক পাত্তর, মন মেজাজ তর থাকবে।

মথুর সাহা পাঁচগাঁয়ের বহুদিনের পচুইমদের কারবারী। গ্রামের বাইরে নদীর ধারে পুরোণো বটগাছের তলায় সারি সারি কয়েকটা মাটির দোচালা ঘর, চারি পাশে নদীর উর্বর পলিতে গজিয়ে উঠেছে

সবুজ সতেজ আখের খেত। বাতাসে মাথা নাড়ে—সুর ওঠে বাতাসে ধরণীর সুপ্ত আনন্দের—তৃপ্তির শিহরলাগা সুর। পাখী ডাকে নির্জন বাগানে।

ওদিকে হরিসাগরেব পাডে ডুধি বোষ্টমীর আশ্রমটা দেখা যায়, থমকে দাঁড়ায় জগন। বহুদিনের বহুবিচিত্র স্মৃতি ওতে মেশামেশি হয়ে আছে। কেমন মধুব একটি সুবেব বেশ। একটি মুখ মনে পড়ে। পুষ্পকে আজও মনে পড়ে এদিকে এলে।

মথুব সাহাব দোকানে তাই আসে ওকে ভুলতে। ব্যর্থ সে চেষ্টা। পুষ্পকে ভোলবাব জন্য প্রথম যৌবনে মথুব সাহাব দোকানে আসে, সেই আসা যাওযাব আব বিবাম নেই।

পুষ্প আজ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। চলে গেছে পাঁচগাঁ থেকে।

মথুর সাহাব দোকানে জমেছে হল্লা, উৎসবেব দিন খদ্দেব পত্রব ভিড় জমে। সামনেব উঠান ভবে গেছে। ওপাশে মথুবেব ভাইপো ডালায সাজিযে বেখেছে ডালবডা, ঘুঘনী, মুড়ি। তাব বিক্রীও বেড়ে গেছে এই ধমকে।

জগনকে দলবল নিযে ঢুকতে দেখে এগিযে এসে নিজে অভ্যর্থনা জানায় মথুর।

—আবে এসো জগন। কতদিন ইদিকে দেখিনি।

কে যেন বলে ওঠে—আর দেখবে কি কবে? নতুন বউ মাথাব দিব্যি দিয়েছে যে। ওই দেখনা তাই হাত গুটিযে বসে আছে। জগন, বলি শেষকালে বিযে কবে কি ঠুটো জগন্নাথই হযে যাবি বে?

কাঁঠালে কালোর কথায় সকলেই হেসে ওঠে। গদা কামাব বলে—তাই বল তোমবা। আমরা তো হাল্লাক হয়ে গেলাম।

জগনের মনের সব বাঁধন যেন কেমন শিথিল হয়ে আসে। বাতাসে এখানে একটা নেশার আমেজ, কেমন যেন পুষ্পকে মনে পড়ে। কামনামদির একটি নারী। তাকে ভুলতে চায় জগন। কণ্ঠে কেমন একটা তৃষ্ণার কঠিন উষ্ণতা।

কুমুদ ক্রমশঃ যেন হতাশই হয়েছে। যতবার চেষ্টা করেছে জগনকে বাঁধতে ততবারই দেখেছে শত সহস্র আদরের ফাঁকে ফাঁকে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করেছে বেপরোয়া লোকটা। কোথায় যেন অধরা থেকে গেছে। শত চেষ্টা করেও আপন করতে পারেনি তাকে।

বারবার দেখেছে কুমুদ তার কথায় জগন—দুদিন চুপচাপ থাকে ভালো মানুষের মত। ঘরের কাজ কর্ম দেখে। গরুবাছুর পালে দেয় মুনিষের সঙ্গে। খড় কাটে, জাবনা দেয় গরুকে। বাড়ীর হাট বাজার করে। রান্না ঘরের দাওয়ায় বসে আসন পিঁড়ি হয়ে গল্প জোড়ে। কত বিচিত্র গল্প—মাঝে মাঝে হাসির হো হো শব্দে বাড়ী মাথায় তোলে। এ জগন যেন অন্য কোন লোক। মন ভরে ওঠে কুমুদের।

কেমন অসহ্য আনন্দ লাগে কুমুদের। মিষ্টি আপনকরা একটি অনুভূতি। লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে ওঠে। ওর আদরের ঠেলায় অতিষ্ঠ হয়ে কৃত্রিম রাগত কণ্ঠে গলা নামিয়ে বলে ওঠে—আঃ, মাসী রয়েছে যে। থাম দিকি।

হাসছে কুমুদ, মিষ্টি হাসি। জগন এদিক ওদিক চেয়ে হঠাৎ একটু ফাঁকা দেখে ওকে ধরবার চেষ্টা করে। কোথায় অলস সুরে ক্লান্ত মধ্যাহ্নে ডাকছে একটা ঘুঘু। দুপুরের রোদ বিবর্ণ হয়ে আসে। কুমুদ শিউরে ওঠে। দুচোখে ভয়ের লজ্জার একটা ছবি। কুমুদ বলে ওঠে চোখের আর মুখের ভাষা দিয়ে—আঃ, কেউ দেখে ফেলবে। যাও দিকি বাপু, দিনরাত পিছনে ঘুর-ঘুর না করে কাজ করে এসো। মাঠে মুনিষ লেগেছে দেখে এসো।

জগন জবাব দেয়—বাঃ রে! তুই তো বল্‌লি ঘরে থাকবে সারা দিন।

কপট রাগত কণ্ঠে বলে ওঠে কুমুদ—তাই বলে দুষ্টুমি করতে বলেছি! চুপ করে থাকবে ভাল মানুষের মত। জগন চেষ্টা করেছে

তাই কিন্তু মাঝে মাঝে অনুভব করেছে তার মনের মধ্যে কি যেন অন্য সত্তা আছে, যে বাইরের বাতাসে নিজেকে মেলে ধরতে চায়। আবার তাই ঝড় ওঠে সারা মনে।

দুদিন চারদিন কেটেছে এমনি নিটোল আনন্দের স্বাদে ভরপুর হয়ে। তারপরই সেই জোয়ারে এসেছে ভাঁটার স্তিমিত টান। দুই কূলের বিবর্ণ পঙ্কিল মাটি বের হয়ে পড়েছে কুশ্রী বিবর্ণতার বেদনা বুকে নিয়ে, জমে আছে মরা কাদায় ছেঁড়া ফুল-দল আর হাজা পাতা।

জগন সেরাত্রে ফেরেই না। কোথায় যায় কে জানে। কুমুদের একাই কাটে বিনিদ্র রাত্রি। থমথমে রাত্রি। শোঁ শোঁ ঝড় ওঠে বাতাসে। তারাগুলো জ্বলছে তীব্র অপলক দীপ্তিতে। তখনও ফেরেনি জগন।

মাসী চুপ করে থাকে, কথা বলে না। ওর চোখেমুখে জমাট একটা হতাশার কালো ছায়া। এতদিনের অভ্যাস বদঅভ্যাসই ভাঙ্গবার চেষ্টা করেছে! মাসী খুশী হয়েছিল —তাই কুমুদ হারলে সে বেদনাই পায় সবচেয়ে বেশী।

মালা জপতে জপতে বলে—তুই খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড় কুমুদ। সে হতচ্ছাড়া যখন আসে আসুক। মুখপড়া কোথাকার, ওদের ধাত পাতই আলাদা বাছা। রক্তে ওদের সেই সর্বনেশে নেশা। সহজে কি ছাড়া যায়।

মাসীর অকারণেই ঈশ্বরের কথা মনে পড়ে। সেও ছিল এমনি বেপরোয়া বেবশ। ব্যাটাও হয়েছে তাই। গজ গজ করে মাসী, কুমুদ কোনও কথা বলে না। আঁধারের দিকে চেয়ে থাকে।

পরদিনই ফেরে জগন। ঝুল ঝাড়া চেহারা, বাড়ী ঢুকে ফাঁক খোঁজে কুমুদকে একলা পাবার জন্য। কুমুদও এড়িয়ে থাকে! সামনেই আসে না জগনের।

হঠাৎ ওকে ধরে ফেলে জগন, হাতে তুলে দেয় নতুন একটা

শাড়ী, সেই সঙ্গে নোটের একটা তাড়া।

—ধর এগুলো!

কুমুদ দপ্ করে জ্বলে ওঠে—ওতে দরকার নাই। তুমিই রাখোগে।

হাসে জগন—রাগ এখনও পড়েনি দেখছি, হ্যাঁরে।

আদর করবার চেষ্টা করে।

—তাতে তোমার কিছু আসে যায়?

সরে গেল কুমুদ ওর বাঁধন কাটিয়ে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে জগন। যেন অতর্কিতে কে চড় মেরেছে তার গালে সজোরে। কি ভাবছে! রুখে দাঁড়িয়েছে জগন।

তার পৌরুষে কোথায় ঘা লাগে, শত শত লোকের মধ্যে এত কৌশলে যে টাকার খেলায় হাত পাকিয়েছে, ইচ্ছা করলেই যে আমিরকে ফকির করতে পারে খেলার আসরে। মেলার আলো ঝলমল পরিবেশ—ব্যাণ্ডের বাজনা, লোকজনের কলরব-কোলাহলের উর্দ্ধে মাথা তুলে থাকে যে লোকটি, সেই অসাধারণ জগনকে চেনেনি কুমুদ।

বাড়ীর সামান্য পরিবেশের মধ্যে জগনের উপর কর্তৃত্ব চালায় কুমুদ, অবহেলা করে তাকে, এটা বেশ বুঝতে পারে জগন। অসহায় রাগে সারা মন ভরে ওঠে। কুমুদের জোর দেখে একটু অবাক হয়েছে সে। সেদিনের মত চুপ করেই সয়ে গেল সে।

এখানে এসে পাড়ার বৌঝি—অন্যান্য বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে পথে ঘাটে দেখা হয়েছে, মিশতে এগিয়ে গিয়ে কুমুদিনী বেশ বুঝতে পেরেছে, তারা হিংসাতো করেই তাকে, তার স্বচ্ছলতাকেও। তাছাড়া ঘৃণা আর চাপা অবজ্ঞার তিক্ত সুরও একটা আছে, তাও টের পায় প্রতি পদে পদে। কুমুদও তাই ক্রমশঃ তাদের কাছ থেকে সরে এসেছে। একাই ঘরের কাজকর্ম নিয়ে থাকে সারাটাদিন।

এদের মাঝে দেখেছে মালতীকে, সে যেন অন্য বৌঝিদের

মত গোত্রছাড়া একটি জীব। সুন্দর সুশ্রী একটি নিরাভরণা মেয়ে হালকা মিষ্টি হাসিতে ওর মুখ চোখ ভরে থাকে, তার বয়সীই হবে।

হাসে দত্ত গিন্নী।

—ঘোষবৌ এর কথায় কান দিওনা ভাই। ওরা সবাইকে নিয়েই কথা বলে। হাড়জ্বালা করা তেঁতো নানা কথা। জন্মাবার সময় ওদের মা বোধ হয় মুখে মধু দিয়েছিল, নিমফুলের মধু।

ওর কথায় থমকে দাড়াল কুমুদ।

মালতী আমন্ত্রণ জানায়—এসো না ভাই অ.মাদের বাড়ী?

—কোন বাড়া ভাই?

—ওই যে।

মালতী পথের ধারে শিবমন্দিরের পাশেই খড়ো বাড়ীটা দেখায়। কয়েকটা আমগাছের সবুজ শান্ত ছায়াঘেবা বাড়ীখানা। ওর মতই একটা মাধুর্য্য বাড়ীখানাকে ঘিরে আছে।

মালতীই ওকে পৌঁছে দিয়ে যায় বাড়ী পর্যন্ত।

ওই একটি বন্ধু পেয়েছে কুমুদ এখানে। তাই কাজের অবসরে ওখানে যায়। গল্প করে দুদণ্ড। মনের কথাও বের হয়ে আসে দুজনের। দুজনে দেখেছে দুজনেব জীবনকে নিবিড়ভাবে। প্রীতির স্পর্শভরা সেই দৃষ্টি।

মালতীকে দেখেছে কুমুদ। হাসি খুশী বৌটি। স্বামীর রোজগার কতটুকু তাও জানে। হৃদয় মুখুয্যে টিকিতে ফুল গুঁজে নামাবলী গায়ে জড়িয়ে যজমান বৃত্তি করে ফেরে। চাল কলা কিছু দক্ষিণা আর ছ'আনির বাবুদের ঠাকুর সেবা করে যা পায় তাতেই চালিয়ে নেয় মালতী। থাকুক অভাব, তবু শান্তির অভাব নেই।

কেমন ছিমছাম সাজানো ছোট্ট সংসার। উঠানের কোণে গোবরে নিকানো তুলসীমঞ্চ, ঘরের রূপই আলাদা। লক্ষ্মীর ঝাঁপি থেকে উঠানের ছোট মরাইটা পর্যন্ত মালতীর মনের শান্তি আর শ্রীর

পরিচয় দেয়।

মালতীকে বলে কুমুদ—তোকে দেখে হিংসা হয় ভাই।

—কেন? মালতীর দুচোখে কৌতূহল।

মোটা লাল পেড়ে শাড়ী আর আভরণ মাত্র দুগাছি লাল শাঁখা। কোন রকমে কায় ক্লেশে দুবেলা চলে—তাও দুপুরে মালতী বসে পৈতে কাটতে।

মালতী হাসে। মিষ্টি সুরেলা হাসি। কুমুদ বলে—সত্যিই বেশ আছিস।

—যাঃ।

তাকে আর কেউ যে হিংসা করতে পারে এই শুনলো প্রথম।

হৃদয় ফিরেছে যজমান বাড়ী থেকে। হাতের কাজ ফেলে উঠে গেল মালতী, স্বামীর হাত থেকে পুঁটুলি ছাতা নিয়ে একপাশে রেখে একখানা তাল পাতার বোনা আসন পেতে দিয়ে পাখা নিয়ে বসে হাওয়া করতে থাকে।

বাড়ীবাড়ী লক্ষ্মীপূজো বষ্ঠী পূজোর হাঙ্গামা সারা এই রোদে যেন আর পারে না হৃদয়, কোন রকমে শ্রান্ত হয়ে বাড়ী ফেরে, তার সব কষ্ট ব্যর্থতার অংশীদার সমব্যথী একজন আছে।

দুপুরের কড়া রোদে ঘেমে উঠেছে হৃদয়, মালতী ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

কুমুদ বাড়ীর পথ ধরে। ওদের দুজনের গড়া এই নিটোল শান্তির সংসারের ছবিটা বার বার তার নিজের জীবনের বেদনা আর ব্যর্থতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কি একটা সে পায়নি জীবনে।

কি নেই তার? স্বামী-সংসার, তাছাড়া জমি-জারাত, বিষয় সম্পত্তি যা আছে দেখে শুনে খেতে পারলে বেশ গুছিয়েই চলে যাবে তাদের। চাই কি একখানা ছোট-খাটো মুদিখানার দোকান দেবে জগন বাজার পাড়ায়। তার আয়েও চলবে। কোন ঝামেলা নেই।

কুমুদ কেমন একটা পূর্ণতার ছবি আঁকে মনে মনে, একটি সুরের রেশও জাগে। চেষ্টা করেছে তেমনি করে জীবনকে গড়তে, কিন্তু বার

ধার কেটে গেছে সেই সুর নির্দয় নিষ্ঠুর আঘাতে। কোন মতেই ফিরিয়ে আনতে পারেনি সেই কল্পনার দিনগুলো বাস্তবের রূপে। জগন শান্তি চায় না, ওর রক্তে মিশে আছে ঝড়ের মাতন। মেতে উঠবেই সে।

জগন হাসে ওর কথা শুনে। নীরব নির্বাক হাসি। রাত্রি দুপুরে কুমুদের সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে—হাসছো যে?

কুমুদের সারা মনে তীব্র জ্বালা, ব্যর্থতার জ্বালা।

জগন হাসি থামিয়ে বলে ওঠে—ওই দোকানের কথা শুনে হাসছি। দু-পয়সার নূন, আধ ছটাক তেল, এক পয়সার সরষে উরে বাপ্! পাগল হয়ে যাব ফরমাসের ঠেলায়। এক আনার খদ্দেরকেওবাবা বলতে হবে।

তার ব্যবসায়ে দেখেছে জগন অনেক খদ্দেরকে। দান এড়ে মাথা নীচু করে বসে থাকে, ওদের উঁচু মাথা কোনদিনই জগনের সামনে তুলতে হয় না।

কুমুদ তখনও অনুরোধ করে চলেছে—তবে জমি-জায়গা দেখা শোনা করো, চাল-ধানের রাখি কারবারও চলতে পারে।

কুমুদ হাল ছাড়েনি, তবু বোঝাতে চেষ্টা করে জগনকে।

জগনও মাথা নাড়ে—উঁহু।

একরোখা একবগ্‌গা মানুষ। কুমুদ জ্বলে ওঠে—তা করবে কেন? রাত-বিরেতে মেলা-খেলায় লোকের সবনাশ না করলে শান্তি হবে না।

বার বার যে কথাটা শুনতে চায় না, সেই হীন ব্যবসা আর তার বাবার পরমগতির কথা তুলে মনের সবশ্রী নষ্ট করে দিতে চায় কুমুদ। ওই কথাগুলো শুনে বিছানায় উঠে বসে জগন।

রাত নিশুতি। মনের মধ্যে ঝড় ওঠে তার।

দপ্ করে জ্বলে ওঠে জগন—চুপ করো বলছি। ছোটমুখে বড় কথা!

কুমুদও ক্রমশঃ মরীয়া হয়ে উঠেছে, তবুও ওকে দেখে থেমে গেল।

বোধ হয় আর ঘাঁটাতে চায় না তাকে। সব পারে ওরা, ওদের চোখের চাহনিকে কেমন ভয় করে কুমুদ, শিউরে ওঠে।

এমনি করেই কাটে দিন, মাস। কুমুদের চোখে-মুখে সেই হতাশার কালো ছায়া দেখা দেয়। মাসীর সন্ধানী চোখের সামনে লুকোতে পারে না। প্রথম প্রথম যে কুমুদ এ বাড়িতে এসেছিল বিজয়িনীর বেশে, এ সে নয়।

সেদিন বুড়ি জেরা করে—হ্যাঁ লা, কি হয়েছে তোর বৌ? অমন মুখ গোমশা করে বসে থাকিস দিনরাত!

কুমুদ বড়ি দিচ্ছিল দাওয়ায় বসে। একটা ছোট গামলায় কলাই বেঁটে আঙ্গুলের ডগে মাপমত কলাই বাঁটা নিয়ে তেল মাখান টিনের পাতে ফেলতে ফেলতে একবার মাসীর দিকে চেয়ে মাথার কাপড়টা টেনে সামলে নিয়ে জবাব দেয়।

—কই কিছু না তো।

কুমুদের অজ্ঞাতসারেই চোখে-মুখে সারা মনে ফুটে উঠেছে পরাজয়ের নিবিড় কালো ছায়া। শত চেষ্টা করেও সে পারেনি জগনকে বাঁধতে। ওর দেওয়া আঘাতে মুষড়ে পড়েছে সে। তার চিহ্ন ওর মুখে।

মাসী কথা বলে না, এক দৃষ্টে কুমুদের দিকে চেয়ে থাকে।

সগুস্নান সেরে বড়ি দিতে বসেছে কুমুদ। আদুড় পিঠে একরাশ চুল এলো করে মেলা, নিটোল পুরুষ্ট গড়ন। দু চোখে একটা শ্রান্তির ম্লান ছায়া। মাসী একবার ওকে দেখে সরে গেল। মনে মনে বুঝতে পারে কোথায় যেন একটা বেদনা ওর রয়েছে।

মাসীর চোখের সামনে ভেসে ওঠে অতীতের দিনগুলো। ঈশ্বরদাস তাকে আনে সেদিন অচল সংসারের ভার তুলে নিতে। বুড়ীরও জীবনে কোন আশা আশ্রয় ছিল না। তাই ঈশ্বরদাসের ওই দয়াটুকুই ছিল তার কাছে যথেষ্ট। তার বেশী কিছু চায়নি।

তাই সে এককালে ওদের এই বেপরোয়া স্বভাবকে চুপ করে মেনে

নিয়েছিল। তার দাবীও তেমন কিছু ছিল না, কিন্তু কুমুদ তার দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, নারীর দাবী। সেটা চুপ করে সয়ে যেতে রাজী নয়।

হঠাৎ জগনকে আসতে দেখে মাসী কোঠার ঘরে উঠে গেল। দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে জগন। দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ বেলা, চারিদিক নিরব নিস্তব্ধ, মাঝে মাঝে ডাকছে একটা ঘুঘু ক্লান্ত উদাস সুরে কেমন নির্জন ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশে। দাওয়ার উপর বসে বড়ি দিচ্ছে কুমুদ; নিটোল দেহ আর আধঢাকা বাহুমূল, পিঠের ওপর কালো একরাশ চুলের এলো স্তূপটা ছড়িয়ে কেমন আলো-আঁধারির নেশা লাগিয়েছে।

বেলা বেড়ে উঠেছে। ঝাঁ ঝাঁ করছে তীব্র রোদ। মথুর সাহার দোকান থেকে বাড়ীর দিকে ফিরছে জগন। মনে একটা ব্যর্থতার জ্বালা। নিজে ওই বিষ খেতে চায় নি, ওদের অনুরোধে মাত্র এক আধটু খেয়েছে।

অতীতের পুষ্পকেই মনে পড়ে ওইগুলো খেলে। নেশা তার হয়নি ওতে, তবু কেমন যেন একটা গোলাবী আমেজ সারা মনে। অতৃপ্তমনে এতক্ষণ সে অন্য অধরা নারী সেই পুষ্পের কথাই ভেবেছিল, একটা তীক্ষ্ণ তীব্র অনুভূতি চেয়েছিল তার মনে। সেই বুভুক্ষিত কামনার আগুনের আলোয় আজ কুমুদকে দেখে হঠাৎ চমকে উঠেছে। নির্জন দুপুর, কেউ কোথাও নেই। এত রূপ, ওর চোখ মেলে দেখেনি এতদিন। কি এক দুর্বার আগুনের শিখায় উড়ে আসা পতঙ্গের মত চলেছে সে।

—কুমুদ! ফিসফিসিয়ে ডাকে জগন।

হঠাৎ কুমুদ কার বলিষ্ঠ বাহুবন্ধনে ধরা পড়তেই চমকে ওঠে। কাল রাত্রি থেকে আসেনি জগন। আজ ওকে এই মত্তবিক্রমে এগিয়ে আসতে দেখে ঘৃণায় শিউরে ওঠে। কুমুদ ওর চেহারার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। চোখ দুটো করমচার মত টকটকে লাল

মাথার চুলগুলো উস্কোখুস্কো। যেন একটা জানোয়ার এগিয়ে আসছে তার দিকে। কি শ্বাপদ লালসা মাখানো ওর দুচোখের চাহনিতে, ওই তপ্ত নিশ্বাসে! ওর নিশ্বাসের তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধটা উদগ্র হয়ে ওঠে, গায়ের ঘামে সেই'টক গন্ধ।

কঠিন স্বরে কুমুদ গর্জে ওঠে।

—দিন দুপুরে মদ খেয়ে ঘরের বৌএর কাছে মাতলামি করতে লজ্জা হয় না? এটা কি মেলা-খেলা পেয়েছো যে পয়সা দিলেই সব কিছু মিলবে?

কুমুদের দুচোখে তীব্র ঘৃণার জ্বালা, তারই উষ্ণ স্পর্শ যেন তীব্র চাবুকের আঘাতের মত ওর সারা গায়ে আছড়ে পড়ে সশব্দে। চমকে ওঠে জগন, সমস্ত নেশার আমেজ ছুটে যায় তার সারা মনে। দুপুরের রোদ বিবর্ণ হয়ে ওঠে।

ওকে ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল জগন। এক নিমিষেই তার কামনার তীব্রতা, সব স্বপ্নসাধ নিষ্ঠুর আঘাতে ছিটকে পড়ে খান খান হয়ে গেছে।

কুমুদও নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে! ওর দিকে ফিরেও চাইল না কুমুদ। ঠাকুরদের জন্য বড়ি দিচ্ছিল, ওই অবস্থায় আর বড়ি দেওয়া যায় না; সারা দেহমন অশুচি হয়ে উঠেছে তার। বাঁশের আলনা থেকে গামছাটা নিয়ে কলাই-এর গামলায় কি একটা চাপা দিয়ে স্নান করতে বের হয়ে গেল। হ্যাঁ, সব অশুচি হয়ে গেছে, দেহমন সব কিছুই।

ব্যাপারটা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখে জগন। এতক্ষণে তার যেন চেতনা ফিরছে। সারামনে জ্বালা করা একটা অনুভূতি। গর্জে ওঠে জগন।

—খুব তোর গুমাক না? জানিস এক লাথিতে তোর গুমাক চুরমার করে দিতে পারি?

কুমুদ কথা বলে না, বের হয়েই যাচ্ছিল ঘাটের দিকে। কথাটা

শুনে উঠানের মধ্যে একবার থমকে দাঁড়াল। তেজস্বিনী একটি মেয়ে, জগনের দিকে চেয়ে থাকে স্থির তির্য্যক দৃষ্টিতে। জগনও জ্বলছে মনে মনে ওর ওই কঠিন অপমানের জ্বালায়। দুচোখে সেই জ্বালাব চিহ্ন। এগিয়ে গিয়ে মনে হয় কুমুদের গায়েই হাত দেবে, ওর কণ্ঠস্বর থামিয়ে দেবে, কিন্তু নির্ভীক চাহনির সামনে বাধা পেয়ে থামল জগন। কুমুদ চেয়ে রয়েছে ওব দিকে, দুচোখে ওব পুঞ্জীভূত ঘৃণা; আর অবজ্ঞার তীব্রতা মেশানো চাহনি। জগনকে যেন পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চায়। জানিয়ে দিতে চায় জগনের চেয়ে সে অনেক উঁচুতে, জগন তার অযোগ্য। ওব কঠিন নারীত্বের সামনে নিজেকে সত্যই কেমন অসহায় বোধ করে জগন। নীরবে আজ কুমুদ ওকে সবচেয়ে বেশী ঘৃণা কবে গেল।

মাসীকে নেমে আসতে দেখে জগন চুপ কবে থাকে। চেঁচামেচি করলে ফল ভাল হবে না। মাসী এখুনি চেঁচামেচি করে পাড়া মাথায় তুলবে। তাকে ববং পাবা যায় কিন্তু কুমুদেব ওই অন্তরটিপুনী কথা আব গা জ্বালানো চাহনি—অসহ্য হয়ে ওঠে জগনের কাছে। জোরে কথাও বললো না অথচ কেমন নীরব অবজ্ঞায় তাকে ছাই করে দিয়ে গেল।

দাওয়ায় বসে থাকে গুম হয়ে। মাসী এগিয়ে আসে জগনের দিকে।

—চান খাওয়া হবে না আজ? বৌটা উপোস দিয়ে থাকবে সারাদিন।

—ওকে খেতে মানা করেছে কে? খাক না। জগন বলে ওঠে।

মাসীরও কেমন অসহ্য হয়ে উঠেছে, ফোঁস করে বলে ওঠে, —ওসবেব মর্ম্মো বুঝবি কিরে লক্ষ্মীছাড়া? বৌ নিয়ে তোদের ঘর করতে মানা। তোর বাপ মিনসে, সেও করেনি। করতে পারেনি। তুইও সেই পথ ধরেছিস। বাপ্‌কা বেটা! হবে না অমন? না হলে অমন লক্ষ্মী বৌ—

মাসীর কথায় জ্বলে ওঠে জগন। বেশ চড়া স্বরেই বলে কথা-গুলো।

—তা লক্ষ্মীছাড়াকে বিয়ে করা কেনে? আমার খুশী হয় খাবো —না হয় খাবো না। কারো ডাঁট সহ্য করবে না জগনদাস। নেহি করেগা। বুকে বসে দাড়ি ওপড়াবে—আমারই খাবে পরবে আর আমাকেই ডাঁটাবে—ইয়ে নেহি চলে গা।

জগন স্বভাবসিদ্ধ মেজাজ আর কণ্ঠে এইবার চীৎকার করে বাড়ী মাথায় তোলে। দুপুরের নীরবতা তার জড়িত কণ্ঠের সদর্প ঘোষণায় খান খান হয়ে যায়। মাসী থামাবার চেষ্টা করে। কিন্তু কে কার কথা শোনে।

মাসীও এই মেজাজ বহুবার দেখেছে ওদের। ঈশ্বরদাসেরও দেখেছিল। আজ কুমুদের চোখে দেখেছে ব্যর্থতার অশ্রু। কি এক নিবিড় বেদনায় মুষড়ে পড়েছে সোনার প্রতিমা। বারবার তাই মাসীর বুক হুহু করে উঠেছে জগনের এই অন্যায়ে। বুড়ীও আজ ফেটে পড়ে এতদিন পর। তাই সেও বলে ওঠে।

—থাম তুই। বাইরে যা করিস করবি। ঘরে যদি মুখ খারাপ করবি ঝেঁটিয়ে মুখ ভেঙ্গে দোব। চুপ করে থাকবি ঘরে। যা চান করে আয়, খেয়েদেয়ে ঠাণ্ডা হ' মাতাল কোথাকার। তেল ঝাড়বো নাহলে।

মাসীকে কোনখানে অহেতুক একটা ভয় করে জগন ছেলেবেলা থেকেই। মাসীর কথায় চুপ চাপ বসে থাকে দাওয়ায় গুম হয়ে। একটু পরে বলে ওঠে—তেল দাও। তা ওকে এসব কথা বলতে মানা করো।

মনের কোণে মাঝে মাঝে এমনি একটা বেদনাময় চিন্তার রেখা পড়ে, আগে পড়তো না এটা। এতক্ষণ না খেয়ে রয়েছে কুমুদ; কাল রাত্রে ও বাড়ী ফেরেনি। মাসী কথা বলে না।

কুমুদ স্নান সেরে বাড়ী ফিরছে। ভিজে কাপড় লেগে গেছে

সর্বাঙ্গে। নির্জন পথ, দুপাশে গাব গাছের কালো জমাট ছায়া, পথে পথে ফুটেছে কাঁঠালী চাঁপা, তারই উদগ্র সৌরভ। কচুর সবুজ ঘন ছায়া চারিদিকে। পাখী ডাকছে—নানা পাখার ডাকে ঠাঁইটা ভরপূর।

—এ্যাই।

জগন ওকে দাঁড়াতে বলে! কুমুদ দাঁড়াল না, পথের মাঝে ওকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করে। জগনের নেশাটা কমে আসতেই কেমন যেন বুঝতে পারে আজ সে কুমুদের গায়েই হাত তুলতে গিয়েছিল। সারা মনে তার দুঃসহ একটা লজ্জা, অনুতাপ।

হঠাৎ ওকে নির্জন পথে দেখে ওর কাছে তাই এগিয়ে যাবাব চেষ্টা করে।

কুমুদ রাগত ভাবেই ফিরছিল। হঠাৎ কি ভেবে একটু পিছন ফিরে দেখে তার দিকে চেয়ে আছে জগন তখনও। দুচোখে কি যেন একটা কামনার নিবিড় ছায়া।

পা চালিয়ে ঘরের দিকে এল কুমুদ। মনের ঝড় তখনও থামেনি।

কুমুদ আজ শিউরে উঠেছে ওর আবিষ্কারে। বেদনাদায়ক তার আবিষ্কাব, কিন্তু তবু তা কঠিন সত্য, দিনের আলোর মতই পরিষ্কার। অনেক আশা নিয়েই এসেছিল সে এ বাড়িতে। বাবাও ভাল ঘরেই দিয়েছিল কুমুদকে। বর সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছিল কুমুদ, নিজেও খানিকটা দেখেছিল মেলায়। তবু নিজেব রূপ যৌবন আর ব্যক্তিত্বের ওপর বিশ্বাস ছিল তার, তাই ভেবেছিল জগনের জীবনের ধারা সে বদলাতে পারবে।

চেষ্টা করেছে এতদিন। প্রতিটি কাজে প্রতিটি দিন সেইভাবে এগিয়ে এসেছে। নিজের ঘর গড়ে তুলবে, গড়ে তুলবে একটি শান্তির নীড়, যার স্বপ্নে যাযাবর ওই জগন ঘর বাঁধবে। ঘরের মায়ায় পথকে ভুলবে। ঘরে প্রতিষ্টিত করবে এমন একটি শান্তির অক্ষয় সম্পদ যা

পাশার ছকে কোন জুয়ার পণ বস্তে এড়ে দেবে না।

কিন্তু সেই চেষ্টা, একান্ত সাধনা কুমুদের ব্যর্থ হতে চলেছে। লোকের কথায়, ঘাটে পথে বৌঝিদের নীরব অবহেলা সয়েছে ; কানে এসেছে জগনের বাবার অনেক নিষ্ঠুর কাহিনী। জগনের মাকে টুঁটি টিপে হত্যা করেছিল তার মাতাল জুয়াখোর শ্বশুর। ওদের বংশের ধারায় মিশে আছে মদ জুয়ার নেশা। ওরা খুন করতে দ্বিধা করে না।

কিন্তু সব যেন ভুলে নোতুন করে মানুষটিকে ভালবাসা প্রেম দিয়ে গড়তে চেয়েছিল কুমুদ। কিন্তু দুর্মদ মগুপ জুয়াড়ীর কাছে প্রেমের দাম কিছুই নেই। আদিম প্রাগঐতিহাসিক নিষ্ঠুর মানবক। কোন সৌন্দর্য্য, সুকুমার বৃত্তির কোন মূল্য নেই তার কাছে।

আজ তাই নিষ্ঠুর জানোয়ারের মত চরম আঘাতই হানতে এসেছিল তাকে। রুখে না দাঁড়ালে আজ জগন তার গায়ে হাতই তুলতো। ঈশ্বরদাস হত্যা করেছিল তার স্ত্রীকে নিষ্ঠুরভাবে, তারই রক্ত প্রবাহিত হয় ওই জগনের দেহে এই কথাটাই প্রমানিত হয়ে যেতো।

কুমুদ তাই রুখে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু আজ পরাজিত হয়েছে সে নিষ্ঠুরভাবে। তাই অন্ততঃ একজনের কাছে এসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। অসহায় নারীর কান্না। মালতির ওকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই। দুপুরের রোদ মলিন হয়ে গেছে। নেমে আসছে অপরাহ্ন বেলা।

—চুপ কর কুমুদ।

মালতির বুকে মাথা রেখে কাঁদছে কুমুদ। এত করেও ওকে ফেরাতে পারলাম না মালতী। ভাবছি অন্যপথ নেব।

—হুট করে কোন কাজ করে বসিস না কুমুদ।

মালতীর দিকে চেয়ে থাকে কুমুদ। অনেক ভেবেচিন্তেই সে এপথ নেবে ঠিক করেছে। ভালবাসা দিয়ে পারলো না:, ঘৃণা দিয়ে যদি ওর মাথা নিচু করাতে পারে, সেই পথই দেখবে।

সেই রাত্রে কথাটা পাড়ে সে। জগন চুপ করে বসে রয়েছে বিছানায়, রাত কত জানে না। জানালার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় নীল আকাশের তারার অজস্র চুমকী, কোথাও যেন শান্তির স্পর্শ নেই, জ্বালাময়ী তার অস্তিত্ব। কোথায় পাখী একবার ডেকে থেমে গেল।

এমনি স্তব্ধ পরিবেশে ম্লান হ্যারিকেনের লালাভ আলো-জমা ঘরের মধ্যে ওই মেয়েটির মুখোমুখি হয়ে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করে জগন। তার ঘোরাফেরার সেই কর্মমুখর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দৃপ্ত জগৎ এ নয়। জগন এখানে একা, তার করবার কিছুই নেই। আজকের ঘটনাটা মনে পড়ে।

কুমুদ বেশ কড়া স্বরেই কথাগুলো বলে চলে, কথাগুলো স্থির নিষ্কম্পকণ্ঠে যেন কোন বিধান দিচ্ছে।

—বাপের বাড়ী যাবো এখানে থাকতে পারছি না আমি।

চমকে উঠে জগন ওর দিকে চাইল। জগন কথা বলে না, আজ ক্ষণিকের জন্য মনে হয় ভাল বেসেছিল সে কুমুদকে, কিন্তু বড় কঠিন ও। রূপ আর যৌবনের দর্প নিয়েই আজ জগনকে চরম আঘাত হানতে চায়।

সে একদিনের অপরাধটাকেও ক্ষমার চোখে দেখে না। সেই তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই জগনকে চরম আঘাত হানতে চায়। এত অপমান অবহেলা করেও খুসি হয়নি কুমুদ।

এটা ঠিক সহ্য করতে পারে না জগন। মনে মনে গজরায় সে। কুমুদের অবজ্ঞা আর অবহেলা ধীরে ধীরে তার মনের চাপা-পড়া সেই দুর্মদ জানোয়ারটাকে জাগিয়ে তুলেছে। কঠিন করে তুলেছে তার অন্তর। জগনও চটে উঠেছে এইবার। কঠিন স্বরে সেও জবাব দেয়।

—বেশতো। বেঁধে কেউ রাখেনি, যেতে চাও যাবে। এত ভনিতা কেনেরে বাবা।

কুমুদ খাটের ওদিক থেকে ওর দিকে ফিরে চাইল। ভেবেছিল অন্ততঃ বাধা দেবে জগন একবার। অনুরোধও করবে থাকবার জন্য,

দুঃখিত হবে তার ব্যবহারে, কিন্তু ও কথায় তার কোন চিহ্নমাত্র নেই। যেন গেলেই নিশ্চিন্ত হয় সে।

—হ্যাঁ। তাই যাবো। চলেই যাবো এখান থেকে। কুমুদ পাশ ফিরে শুলো। জানালার বাইরে শিউলী গাছের পাতাগুলোয় সবুজ আঁধার মেশামেশি, ওরই মাঝে সাদা সাদা ফুলগুলো তীব্র সৌরভ স্বপ্ন নিয়ে কি বেদনায় ঝরে পড়েছে।

মনে হয় তারই মত নিস্ফল ওদের জীবন, রূপ গন্ধ নিয়েও শুধু হতাশায় কেঁদে ঝরে পড়ল রাতের আঁধারে।

কান্না আসে দুচোখ ছেয়ে। জগন ফোঁস করে ওঠে।

—ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ কান্না আমার ভালো লাগে না। চুপ কর দিকিন, সারারাত কি এই চলবে?

বাধা মানে না কুমুদের চোখের জল। কাঁদছে সে বার্থ বেদনায়, তার সন্ধান জগন রাখে না। সরে গেল জানালার কাছে, আঁধারে কাঁদছে কুমুদ।

জগন অন্য জগতের মানুষ। সেখানে কান্নার কোন দাম নেই। দাম ওরা দিতে জানে না।

মাসী ব্যাপারটা কিছু অনুমান করতে পারে। আজকালকার মেয়ে এরা, গলা ফাটিয়ে ঝগড়া করে না। মারও খায়, চুপ চাপ থাকে বুকভরা আগুন নিয়ে, একদিন চুপ করেই সরে যায় দুজনে দুপাশে। কুমুদ তাই যেন সরে যেতে চায়।

গজ গজ করে মাসী, ওর বাপের বাড়ী যাবার কথা শুনে। আজ বুড়ি ধৈর্য হারিয়েছে।

—অধঃপাতে যাবি জগা, ঘরের লক্ষ্মীকে বুঝিয়ে বল, মানা কর ওকে।

জগন আজ বেপরোয়া, দাওয়ায় ছকগুটিগুলো বের করে রোদে দিয়েছে, মাঝে মাঝে গুটিগুলো দান ফেলে পরখ করছিল।

মাসির কথায় জগা বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে বলে ঘরের—লক্ষ্মী

না কচু। ঘরের লক্ষ্মী আমাব ওই। ওতেই কাপড়, ওতেই ভাত। ওই বেঁচে থাক বাবা, অমন কত লক্ষ্মী জুটবে!

তিন তাসের বাক্স আর জুয়োব ছকটা দেখিয়ে বলে—বাব্বা, উটি বজায় থাকলেই সব হবে। বৌ-এর পর বৌ আসবে! কতো চাই, ক'গণ্ডা!

চমকে ওঠে মাসী। এমনি কথা ঈশ্বরদাসও বলেছিল একদিন ওই খানে বসে। জুয়াব ছকে ওবা বৌকেও দান আড়তে গববাজী নয়। তাই বৌ ওদেব এমনই মর্য্যাদার বস্তু। ঈশ্বরদাসেব মতই লক্ষীছাড়ার কথাবার্তা। সেও খুব সুখী হয়েছিল। কথাটা ভাবতে শিউরে ওঠে মাসী।

মাসীব মুখ ছোটে—বাপের অক্ত যাবে কোথায়? মেলা বৌ তুদেব বে আঁটকুড়ো। কুকুবেব মাগ তুদেব—লেখাজোখা নাই।

—এ্যাও! জগন গর্জ্জন কবে ওঠে।

মাসীও আগেকাব দিনগুলো যেন স্মবণ কবতে পাবে। সব একে-বাবে মিলে যাচ্ছে চক্‌কে চক্। ঈশ্ববদাস মদ খেয়ে চোখ জবা ফুলেব মত রাঙ্গিয়ে দাওযায বসে হাঁকডাত। সেই সঙ্গে মুখ ছুটতো, দক্ষ দাসীব বলিয়ে কইযে মুখ। তেমনি চাঁছা ছোলা কথা। সামনে দাঁড়ানো দায়, আজও সেখানে দক্ষ দাসী রুখে দাঁড়ায জগনের সামনে।

—মাববি নাকি রা! নাথি মেবে ঘবকন্না ফেলে চলে যাবো তুদের। বৌ নিয়ে ঘব কববি তুই? সে ববাত তুদেব আছে, ডেঙ্গো মবদটা কুথাকাব।

জগন কেমন নিস্পৃহ নিরাসক্ত দর্শকেব মত সমস্ত ব্যাপাবটা দাঁড়িয়ে দেখে। এ ব্যাপারে তার করণীয কিছুই যেন নেই। মুনিষটা গোয়াল থেকে বলদ জোড়াটা বের কবে টপ্পর লাগানো গরুব গাড়ীর যোয়ালে জুতে কুমুদের বাক্সটা তুলে আনে।

যাবার আয়োজন নিজেই করেছে কুমুদ। সারারাত ঘুমোয়নি

সে। কেমন যেন চোখ জ্বালা করছে অনিদ্রায় দুশ্চিন্তায় আর সারা মনের তীব্র ব্যর্থতায়। জগন একবারও নিষেধ করেনি, বাধা দেয়নি তার যাবার আয়োজনে। এড়িয়ে গেছে একেবারে।

মাসীও অবাক হয় জগনের ব্যবহারে। বেশ জোর গলাতেই ঘোষণা করে—ছারখারে যাবি জগা। সতীলক্ষ্মীর চোখের জলে লঙ্কা ছারেখারে গেছে। হেই বাবা।

—ধ্যাৎ। যানে দেও।

জগন রুখে দাঁড়িয়েছে।

আজ মাসীর চোখের সামনে কি যেন একটা অন্যছবি ফুটে ওঠে। কেমন যেন হতাশার কালোছায়াঘন সেই ছবিটা। এতদিন ভেবেছিল এবাড়িতে যাকে এতটুকু থেকে মানুষ করেছে সেই জগনের উপর একটা জোর আছে। সেই জোরের কথা ভেবেই জগনকে সংসারী করতে চেয়েছিল। বিয়ে দিয়ে এনেছিল কুমুদকে, আজ কুমুদকেই সবচেয়ে বেশী আঘাত দেয়নি জগন, তার মনেও বেজেছে এই আঘাত নিবিড়তর হয়ে।

মাসী কাঁদছে আজ। এতদিন জীবনের অন্য স্বাদ সে পেয়েছিল, মধুর তৃপ্তি আনা এজীবনের স্বাদ। কিন্তু সেই সুন্দর পরিবেশটিকে জগনই শেষ করে দিল।

তবু আশা করে বুড়ী এসব ঝড় আবার থেমে যাবে। আবার শান্তির স্পর্শ নেমে আসবে তার সংসারে। তাই বলে—বেশী দিন বাপের বাড়াতে থাকবি না কুমুদ। তোদের ঘরসংসার আর আমি আগলাতে পারবো না। পূজোর পর ভাইফোঁটা সেরে ফিরে আসবি।

কুমুদের দুচোখ ছলছল হয়ে ওঠে। সে প্রণাম করে গাড়িতে উঠল।

বৃথাই একবার কাকে যেন অন্বেষণ করে কুমুদ। কিন্তু জগন তখন কোথায় আড্ডায় বসে গেছে। কোনদিকে তার খেয়াল নেই।

কুমুদ কয়েক মাস পর বাপের বাড়ি ফিরছে। সাধ সম্মান করা থাকা গেরস্ত, তবু কোথায় একটা ব্যথা অনুভব করে কুমুদ। গ্রামের সীমা ছাড়িয়ে চলেছে গাড়ীখানা বাদশাহী সড়ক ধরে। বর্ষার শেষ, শরতের প্রারম্ভ। দুধারে সবুজ ধানক্ষেতের উপর উড়ে বেড়ায় হলদে ফড়িংএর দল, ধানক্ষেতের বুকে জলগড়ানির শনশন শব্দ। মাঝে মাঝে দামাল হাওয়ায় নুইয়ে পড়ে দিগন্তব্যাপি সবুজের আস্তরণ, বাঁধের মাথায় ফুটেছে কাশ ফুল—এখানে ওখানে রাস্তার ধারে জমা কালো জল আলো হয়ে উঠেছে শালুক শাপলার ভিড়ে।

কেমন মন কেমন করা পরিবেশ। বোধনের ঢাকের শব্দ আসে দুর গাঁ থেকে ধান ক্ষেতের উপর দিয়ে ভেসে ভেসে—শব্দটা তাকে ছুঁয়ে অসীম আকাশে পেঁজা তুলোর মেঘের মেলায় কোথায় উধাও হয়ে যায়।

বাপের বাড়ির স্মৃতিমধুর দিনগুলো মনে পড়ে। জগনের কথা যেন ভুলে যাচ্ছে। বিশাল পৃথিবীর মাঝে সবুজ মুক্ত উদার দিগন্ত সীমার বুকে নিজেকে আবার সহজ ভাবেই ফিরে পায় কুমুদ। মনের জড়তার গুরুভার হালকা হয়ে আসছে।

কুমুদ ক্রমশঃ যেন শান্ত হয়ে আসছে। নদীর বুকে বর্ষার জল নামা ঘোলা জল থিতিয়ে কালো হয়ে আসছে। রাগটা পড়ে আসে তার। এতটা রাগ করা ঠিক হয়নি মনে হয়।

আসবার সময় মাসী শুধু কেঁদেছিল। ওর কান্নার চেয়ে জগনের নিরব চাহনিই কোথায় যেন আজ বুকের গভীরে কাঁটার মত খচ-খচ করে বাজে, একটা স্তব্ধ মধুর বেদনাদায়ক অনুভূতি। পুরুষ মানুষ তাই মুখ ফুটে দোষ স্বীকার করতে পারেনি।

একটা ভ্রমর গুণ গুণ করে উড়তে উড়তে আসে পথের ধারে আকন্দ ফুলের বুক থেকে।

হাসে কুমুদ—মাগো, বেহায়া ভ্রমরটা কি গালেই বসবে শেষ

কালে। তবু ভ্রমরটা পিছু ছাড়ে না, গুন গুনিয়ে আসে।

হাত দিয়ে তাড়াবার চেষ্টা করে বার বার সেই দুষ্ট ভ্রমরটাকে। ধেৎ। চোখে হাসির আভা। একটা চাপা লজ্জা আর কামনা মেশানো ব্যাকুল ব্যর্থ মিনতি।

জগনের চাহনীটা ভেসে ওঠে, ব্যাকুল সে চাহনি। বার বার তাকে একলা পাবার জন্য কেমন বেহায়াপনা! ওর দৌড় কতদূর বুঝে ফেলেছে কুমুদ।

পুরুষজাতটাই এমনি। মাথা নীচু করতে বাধে তবে এত তড়পানো কেন! মনে হয় চলে এসে ভালই করেছে। ঠেলাটা বুঝুক কদ্দিন, তারপর মাথা নুইয়ে আবার আসবে সুড় সুড় করে মরদ।

গাড়ীটা জল-কাদা ভর্তি পথে হ্যাঁচ-ক্যাঁচ করে একাৎ ওকাৎ হয়ে চলেছে। ইস, বাতাসের ঝাপটায় আর অতর্কিত হেঁচকানিতে গা আর বুকের কাপড় কোন দিকে চলে গেছে। অফুরান যৌবন আর মনের হালকা সুর মিশেছে ওই ধানক্ষেতের দিকহারা বাতাসে; কেমন যেন উধাও হয়ে যায় মন কাপড়টা কেমন খসে খসে পড়ছে বার বার গা থেকে।

কি লজ্জা। কাপড়-চোপড় ঠিক করে নিয়ে তাড়াতাড়ি চেয়ে দেখে। ভ্রমরটা তখনও আশে পাশে গুণ গুণ করে ফিরছে বেহায়ার মত।

হাসি আসে কুমুদের। জগনের কথা মনে পড়ে অকারনেই বার বার। হ্যাঁ, জব্দ হোক লোকটা একটু। বড্ড তেজ আর দেমাক।

গাড়ীখানা বাপের বাড়ীর গ্রাম সীমার কাছে এসে পড়েছে। ওই যে নীল নির্জনে মাথা তুলে আছে এক কোণে তালগাছটা, ওরই পাশে তিরোল গাছ। মন যেন ছুটে যেতে চায় ওরই নীচে তাদের বাড়ীতে।

—কইরে তোর গরু যে চলছে না?

গাড়োয়ান গরুর ল্যাজটা মোচড় দিয়ে বলে ওঠে কুমুদকে—কি কাদা মাঠান, চাকা তক নিত্তলান না হয়ে যায়। এত গাঁ থাকতে মনিব আর বিয়ে করতে গাঁ পেলে নাই। এলো ইখানে। একা নদী ষোল কোশ। আসতে গরু বাছুর লবেজান।

হাসে কুমুদ, বলে—তা ফিরে গিয়ে মুনিবকে পাকা সড়কওলা গাঁয়ে আর একটা বিয়ে করতে বলবি ?

লজ্জা পায় মুনিষটা, জিব কেটে বলে ওঠে—কি যে বলো মাঠান্। বলে পাঁচন পেটা খাই আর কি মুনিবের কাছে! উরে বানতানাস রে। মুনিব যা বদরাগী।

মুনিষটা মুনিবের ব্যাখানা সুরু করে—উকে, চাকলার লুক ডরায়। যেমনি মরদ তেমনি হাকাড়ি। দফরফ দেখনি মাঠান্। ভয়ে কাঠ হয়ে যাবা সে মূর্তি দেখলে।

মনে মনে হাসে কুমুদ, বিজয়িনীর হাসি। দিনকতক যাক—খেজুরগাছ তেল পারা হয়ে যাবে কুমুদের কাছে। ওর দফরফ, মর্দানি দেখাবার জায়গা আলাদা, ডরাবে তাকে অন্য লোক। কুমুদের কাছে তাকে মাথা নুইতেই হবে। তার সামনে সে আর কোনদিনই মাথা তুলতে পারবে না।

ভ্রমরটা এখনও পিছু ছাড়েনি। গাড়ীর টপ্পরের আশে পাশে গুণ গুণ করে ফেরে—এক এক বার সরে যায় দূরে, আবার হাওয়ায় ভেসে আসে। ওকে বার বার দেখেও যেন আশ মেটে না।

ভ্রমর আর জগনের কথা হারিয়ে যায় মনের গভীরে। গাড়ীখানা বাড়ীর কাছে এসে দাঁড়াল। মা ভাই এগিয়ে এসেছে। বাড়ীর পথে নামল কুমুদ। মা হাসি ভরা মুখে ওর দিকে চেয়ে থাকে। ঝলমল তার সাজ বেশ, দুর্গা প্রতিমার মত মানিয়েছে কুমুদকে। মা এগিয়ে আসে, হাসি ভরা চোখে বলে ওঠে—যাক আমার পূজো মানালো এইবার। তা হ্যাঁরে, জামাই এল না ?

কুমুদ বলে ওঠে—তার খবর আমি জানি না বাপু।

হাসে সকলেই, বড় ভাজ বৌও মুখে কাপড় দিয়ে হাসি সামলায়। বলে—খুব যে সাধু সাজা হচ্ছে।

কুমুদও হাসে, কথার জবাব দেয় না। কোথায় যেন একটা স্তব্ধ বেদনা বাজে তার বুকে। হাসি আপনা আপনিই মলিন হয়ে আসে।

প্রথম ধাক্কাটা সামলাতে দু-চারদিন কেটে যায় জগনের। চমকে উঠেছে কুমুদের এই ব্যবহারে। ঠিক এমনি ধাক্কা, এমনি অবহেলা জীবনে সে পায়নি এর আগে। কেমন যেন বদলে গেছে জগন কোনখানে। আগে এইসব তুচ্ছ ব্যাপারে মাথা ঘামাতো না জগন। রাতদিন আড্ডা আর জুয়ার ছক, না হয় তাস নিয়েই থাকতো। সেই জগন যেন বদলেছে।

আজ বিয়ে করে এমনি একটা মন জন্ম নিয়েছে, যে তুচ্ছ এই অবহেলাটুকুও ভুলতে পারে না, তার কাছে এটা বেদনাদায়ক বলে মনে হয়। অনাস্বাদিতপূর্ব কেমন একটা নোতুন সদ্যজাত বেদনা। বাইরে বের হতে লজ্জা আসে জগনের। মনে হয় রাস্তার দুপাশের লোক তার দিকে চেয়ে রয়েছে, দুচোখে তাদের চাপা পরিহাসের হাসি। কথায় ঝরে পরিহাসের সুর। জগনকে হারিয়ে দিয়ে গেছে একটি মেয়ে—এ যেন জগনের চরম পরাজয়, লজ্জা।

গদা কামার ডাকতে আসে—মুষড়ে পড়লে ওস্তাদ। ছোঃ। কথা বলে না জগন।

অবসর সময়ে ঘরেই থাকে, আনমনে তাসগুলো নিয়ে নাড়া-চাড়া করে, না হয় চামড়ার কৌটায় গুটি পুরে হাত সরল রাখবার মহড়া দেয় জুয়ার ছকে।

ওই গুলোই যেন তার সঙ্গী হয়ে উঠেছে। এ এক সময় কাটাবার সঙ্গী। মাসী তাড়া দেয়—ওঠ রে জগা। নে বাবু চানটান করে খেয়ে আমাকে রেহাই দে। ভাবলাম বুড়ো বয়সে দুদিন একটু জিরোবো—তা বলে না, যিখানে যাও বঙ্গে, কপাল

তোমার সঙ্গে। কপালের লেখন তোর হাড়িঠেলা, সী যাকে কোথায়।

জগন অন্য সময় হলে গর্জ্জন করে উঠতো। সেও চুপ করে ছক তুলে স্নানে যায়।

মনে মনে ভাবে একটা কথা। নিজের হাতে অপরের ভাগ্যের ছক নিয়ন্ত্রণ করে তাদের পাওয়ার, কিন্তু নিজের ভাগ্যকে কিছুমাত্র বদলাতে পারে নি সে। তার ছকে কেবলই হার হয়ে চলেছে।

শূন্য বাড়িটা যেন খাঁ খাঁ করছে। একজনের উপস্থিতি আর তার হাসির শব্দ সারা বাড়িটা ভরে রাখতো, ভরে রাখতো দুটি ব্যর্থ বঞ্চিত মানুষের মন, আজ সেইটাই মনে হয় বারবার।

পূজোর সময় জম জমে হয়ে ওটে পাঁচগাঁ। আকাশে বাতাসে ঢাক-শানাইএর শব্দ। শিউলি গাছটা থেকে অঝোরে কেবল ফুল ঝরছে। কুমুদ ফুলগুলো কুড়িয়ে বোঁটা কেটে শুকতে দিত, ফুলে গাঁথতো মালা।

কত রকমের মালা। নোতুন বৌ মালা গাঁথছে, আড়াল থেকে খপ্ করে জগন সেটা তুলে নিয়ে ওর গলায় পরিয়ে দেয়, চমকে ওঠে কুমুদ—ওকি হচ্ছে?

—মালা বদল।

—ছিঃ, ঠাকুরদের মালা। কি করলে বল দিকি।

আজও ফুল ফুটেছে। কেউ কুড়োবার নেই। তলা বিছিয়ে পড়ে আছে নীরব কান্নার মত। কেউ তাদের আদর করে তুলে নেয় না। শুকোচ্ছে অনাহুতের মত। মালা গেঁথে পূজোতেও দেয় না কেউ।

মেজাজটা ভাল লাগে না জগনের, বের হয়ে যায় বাড়ী থেকে। গ্রামের কোলাহল ছেড়ে ময়ূরাক্ষীর দিকে এগিয়ে যায় পড়ন্ত বৈকালের ম্লান আলোয়।

নদীর বন্যাবিরোধী উঁচু বাঁধের উপর থেকে যতদূর চোখ যায় সবুজ

ধান ক্ষেত। মাঝে মাঝে গ্রামসীমার কোল ঘেঁষে আখের ক্ষেত। নদীর বাঁকের মাথায় মল্লিকদের ঘন সবুজ বাগান, দিগন্তপ্রসারী ধানক্ষেত সীমা আঁধার কালো রং মেশামেশি করে দাঁড়িয়ে আছে। তার সঙ্গে রং মিশিয়েছে সামনের আমবাগানটা। ওরই মাঝে বালির চরে গেরুয়া জলের ধারে পলিমাটিতে সাদা কাশ ফুলের মেলা, এখানে ওখানে গজিয়েছে কাশের ঝোপ। সাদা চন্দনের ছিটে মেখে ঘন সাববন্দী লম্বা ঘাসগুলো হাওয়ায় কাঁপছে। দাঁড়িয়ে আছে সবুজ ধরণী, উপরের নীল আকাশেও চন্দনের ছিটে ভরা সাদা পেঁজা মেঘস্তূপ। ময়ূরাক্ষীর বুকে তখনও যৌবনের জোয়ার যায় নি। গেরুয়া জল থিতিয়ে এসেছে ঈষৎ কাঁচ কাঁচ আভার পানে, তবু দুকূল ওর পূর্ণতার স্বপ্ন, বর্ষার সেই মাতনলাগা মত্ততা ওতে নেই, আছে একটা স্থির গাম্ভীর্য্য। যৌবন যেন চলে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়েছে, কি অপরূপ রূপ-মাধুর্য নিয়ে।

মনে কেমন ঝড় বয়। নদীর এইদিকে আসতে পারে না। তার জীবনের সব ক্ষতিটা মনে পড়ে। পুষ্প চলে গেছে আগে, এসেছিল কুমুদ। সব ক্ষতি তাব পূর্ণ হয়েছিল, কিন্তু সেও চলে গেল ওই নদী পারের পথ ধরে।

হরিসাগরের ওদিকে নদীর বাঁধের উপব বসে আনমনে কি ভাবছে সে; বাতাসে ভেসে আসে বাবুদের বাগান থেকে শেষ কেয়াফুলের সৌরভ। মনে হয় কার যেন কান্না বাতাসে মিশে আছে। আকাশে জাফরাণী মেঘের কুচি ইতস্ততঃ ছড়ানো; থেকে থেকে পাখী ডাকে। জগন চুপ করে বসে আছে। সব কিছু এড়িয়ে একজনের জন্য মনের এতটা ফাঁকা জেগে উঠবে কল্পনা করতে পারে না সে।

দলের সাকরেদ গদা কামার, পল্টু, মদন সাঁপুই, পাঁচু এরা চিন্তিত হয়ে পড়েছে ওস্তাদের উড়ু উড়ু ভাব দেখে। এমন কাজে উদাস হলে এ ব্যবসা চলে না। চারিদিকে চোখ চাই, সদাসর্বদাই সচেতন থাকতে হবে। নইলে মোটা লোকসানের ধাক্কায় দল চুরমার হয়ে যাবে।

দলের সবাই দেখেছে জগনের খেলায় কেমন মন লাগে না। বেশ

চিন্তিত হয়ে পড়েছে তারা। এদিকে বর্ষা-শরতের শেষ। মরসুম এগিয়ে আসছে।

পূজোর পরই দু-চারদিন সাঁইথের খেলা। ধনী জমিদার নন্দনরা এই সময় বেশ ছোট্ট আসরে বড় বাজীর খেলা ধরে। শাঁসালো কাপ্তেনের দল। কালীপূজো তক চলবে এই আসর, নিরাপদ ব্যবস্থা। বাবুদের বাড়ীতেই বসবে এই আসর। ঝামেলা, হুজ্জুতি কিছু নেই। ধরো দান, মারো বাজি। মোটা বাজি, গেলো তো রসাতল। কিন্তু কোথায় যেন গরবর হয়ে গেছে জগনের মনে, ওদিকে আর মন আসে না।

জগন নিজেও সেটা বুঝতে পারে। তাই যেন সরে এসে চুপ চাপ বসে আছে। বৈকালের লাল আলোর আভা গাছ-গাছালির মাথা রাঙ্গিয়ে ম্লান কালো ছায়ার হতাশ বুকে নিয়ে পড়েছে নদীর অস্বচ্ছ জলে। বাতাসে কেমন একটা কান্নার সুর।

আজ নির্জন ম্লান রৌদ্রভরা বিষন্ন একটি অপরাহ্ন বেলায় বসে কি ভাবছে জগন। এ ভাবনার কূল তল নেই। সব হারিয়ে গেছে তার। কুমুদ গেছে, গেছে পুষ্পও।

প্রথম যৌবনের একটি উজ্জ্বল স্মৃতি, শত পাওয়ার ভিড়েও তার ঔজ্জ্বল্য এতটুকু কমেনি। আরো যেন ঝলমল করে উঠেছে শতগুণে। কুমুদকে পেয়ে ভেবেছিল এই বোধহয় সত্যিকারের পাওয়া ; তাই তাকে নিয়েই ভুলেছিল। কিন্তু খতিয়ে দেখল যেদিন, সেদিন শিউরে উঠেছে। কুমুদকে মনে ধরেনি। তার নানা বাঁধন আর দাবী।

পুষ্প কিন্তু কোন দাবী নিয়ে আসেনি। সারা মনে এনেছিল নোতুন এক জাগরণ। ঈশ্বরদাস তখন বেঁচে। ডুবিবোষ্টমী—পুষ্পর মা সেও চেয়েছিল, তাদের ঘরে এমন হয়। জাতবোষ্টম, হোক না বিয়ে থা, তারাও ঘর পেলে ঘর বসত করবে। তাই পুষ্পকে হয়তো মনে মনে সমর্থন করেছিল গোপনে।

এমনি কতো অপরাহ্নে জনহীন হয়ে আসতো নদীতীর। আমবাগানের মিশ-কালো গাছগুলির অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ় হয়ে উঠতো

সন্ধ্যার আগত অন্ধকারে। কাশবনে বইতো শিহর লাগানো হাওয়া বিচিত্র একটি সুরে।

পুষ্পকে পেয়েছিল এমনি মুক্ত উদার দিগন্ত সীমায়। বিরাট ধরণীর এক ঐক্যতান সুরে একটি নীড়ের মত সুরেলা স্পর্শে।

পুষ্প গুনগুনিয়ে গান গাইত, মায়ের মুখে শোনা মহাজনী পদাবলী :

অঙ্গনে আওব যব রসিয়া,
ঈষৎ পলটি হাম্ চলব হাসিয়া।
আবেশে আঁচর পিয়া ধরবে
যতন বহুৎ হাম্ করবে॥

সুরেলা কণ্ঠের ওই গানে কি যেন যাদু আছে। আছে কি এক নিবিড় মায়া। মুগ্ধ অপলক দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থাকতো সে।

—হাঁ করে দেখছো কি গো? পুষ্প হাসিতে ফেটে পড়তো গান থামিয়ে। মাথা নামিয়ে নিত জগন। লজ্জার আভা সারা মুখে চোখে। ও পদের মানে জানো? রাধিকার বিরহ বোঝ?

পুষ্পের কণ্ঠস্বরে হালকা সুর।

হঠাৎ চমক ভাঙ্গে জগনের। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না। পুষ্প! হ্যাঁ পুষ্পই, নদীর ঘাট থেকে সদ্য স্নান সেরে উঠে আসছে। আরও পরিপূর্ণ আর সুন্দর হয়েছে সে। হাসছে তাকে দেখে, মধুর একটু হাসি।

হঠাৎ ওকে নদীর ঘাট থেকে উঠে আসতে দেখে চমকে ওঠে জগন। বুকের রক্ত ওর চলকে ওঠে। ওই সদ্য স্নান সারা মেয়েটির কাঁখের কলসীর মতই তার বুকে একটা ছন্দ কলকলিয়ে ওঠে।

—স্বপ্ন দেখছো নাকি গো ওস্তাদ?

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে জগন মেয়েটির দিকে। সব সুর একসঙ্গে বেজে ওঠে মনে। বিচিত্র সুরের অনুরণন। বাতাসে তারই সুরের রেশ। আঁধারের বুকে ফুটে ওঠে দুএকটা তারার ম্লান দীপ্তি। সন্ধ্যা নামছে পূর্ণ প্রশান্তি নিয়ে।

এতটুকু বদলায়নি পুষ্প, তেমনিই আছে। এখনও ঠোঁটের আগায় তেমনি মিষ্টিহাসির নেশা লাগানো ঝিলিক ওঠে। কথায় পরিহাসের তরলসুর। এগিয়ে তার কাছে এসে দাঁড়াল সে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে দেখছে পুষ্প আর ভাবছে হারান অতীতকে।

স্তব্ধ নির্জন সবুজ আঁধার মাখা নদী তীর; বাতাসে কেয়ার সৌরভ আর নদীর শেষ যৌবনের কান্নার সুর। ওর চোখে তারই নেশার কি যেন আহ্বান। কাপড়খানা গায়ে বসে গেছে, তাই টেনে টুনে এদিক ওদিক ঢাকবার অকারণ চেষ্টা করে। ব্যর্থ হতে হেসে ফেলে, চাপা একটু হাসি।

—এখনও এখানে আস তাহলে? তা বাক্যি বন্ধ হয়ে গেল নাকি গো? বলি আগে তো হা করে চেয়ে থাকতে না বোকার মত, বিয়ে করেই বোকা বনে গেছো দেখছি। তার খোঁজ নিলাম, সে তো দেশান্তরী হয়েছে! তুমিও তো দেখছি বেবাগী হব হব করছো। ইযে প্রেমজ্বরের বিকারের তড়কা মনে হচ্ছে মাইরী।

কথা বলে না জগন, চতুর রসিকা ওই মেয়েটির দিকে চেয়ে থাকে। হাসছে মুখ টিপে। সুগৌর নিটোল মুখে হাসির আভা।

—কবে এলি, জগন প্রশ্ন করে।

হাসে পুষ্প—ঢাকে কাঠি পড়লো, উটাকে ফেলে দিয়ে চলে এলাম। ব্যস। একঘাট ছেড়ে এলাম ভিন ঘাটে। কাঁহাতক আর একঠাঁই মন টেকে বল!

বিচিত্র ওই পুষ্প। ওর মাকে এ অঞ্চলের চেনে সবাই। পুষ্পকে ভুবিবোষ্টমী এক একবার নিয়ে বের হয়। দূর-দূরান্তের কোন বৃহৎ বৈষ্ণবের আখড়ায়, কোন গৃহী গঙ্গাযাত্রীর সঙ্গে বেশ কিছু টাকা নিয়ে ওকে মালা চন্দন করিয়ে রেখে ফিরে আসে আবার গ্রামে। মেয়েকে কোনদিন রঘ-বসত করাতে চেয়েছিল ওই জগনকে কেন্দ্র করেই। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। তারপর থেকেই এই পথ ধরেছে,

কিন্তু দেখেছে সবাই ওদের ঘৃণা করে, উপভোগ করতে চায়—আপন করতে রাজী নয় কেউই।.

হরিসাগরের ধারে ছোট্ট আখড়ায় আবার এসে বসে ডুবিবোষ্টমী। সকাল বেলাতেই গ্রাম গ্রামান্তরের পথে পথে ওকে দেখা যায় স্নান সেরে চাট্টি চুল মাথার উপর ঝুঁটি বেঁধে খঞ্জনী হাতে গান গেয়ে মাধুকরী করছে এপাড়ায় সেপাড়ায়। সকলের সঙ্গেই আলাপ। এককালে এ গ্রামের সেইই ছিল লাস্যময়ী নায়িকা। আজও কথাবার্তায় সেই সুর ঝরে পড়ে। তার মিষ্টি সুরেলা গলায় অতীতের এতটুকু স্মৃতি এখনও রয়ে গেছে, কোথাও কোন পরিবর্তন হয় নি। পুষ্পকে চৌঠা বার মালা চন্দনের দরুণ পাওয়া টাকা এক একবার পোষ্টাপিসে গিয়ে কিছু কিছু করে জমা দিয়ে আসে সঙ্গোপনে। এমনি করে বেশ কিছু টাকা জমিয়েছে ডুবি। আরও জমাবে যদ্দিন বাজার পাবে।

অন্য কোনখানে ডুবির পরিবর্তন দেখা যায় না। সকালে মাধুকরী করে ফেরে, তারই সংগৃহীত চাল আর আশ্রমেরও কিছু জমি জাবত আছে। এই তার একার পক্ষে যথেষ্ট। চলে যায় এমনি করেই

হরিসাগরের জলে জমা ঘন দল পানাড়ীর আড়ালে জল পি পি ডুব দেয় মাছের সন্ধানে; আর একজন বসে থাকে বাঁধানো ঘাটলার ধারে ছিপ হাতে মাছের আশায়। ঘড়ির কাঁটার মত স্থির তার আসা যাওয়া। মাছ কোনদিন পেয়েছে কিনা জানে না, তবু ছোট তরফের রাঙ্গাবাবুর আসার বিরাম নেই। অনেক বছর থেকেই আনা গোনা। যৌবন গেছে বার্দ্ধক্য এসেছে। তবুও আসে। দুপুরের রোদ ঝাঁঝালো হয়ে উঠলেই বুড়ো ছিপ ফেলে এগিয়ে যায় বকুল গাছের নীচে ডুবি বোষ্টমীর আখড়ার দিকে। বহুদিনের অভ্যাস ওই রাঙ্গা-বাবুর। যৌবনকাল থেকে চলে আসছে এই আসা যাওয়া, আজ বার্দ্ধক্যের প্রান্তে এসেও থামেনি, নেশাটা স্বভাবে পরিণত হয়েছে।

ডুবি দাওয়াতে আসন পেতে দিয়ে অভ্যর্থনা জানায় রাঙ্গাবাবুকে। অতীতের একটি রসিক মানুষ ডুবির ভাগ্য ফিরিয়ে দিয়েছে, কিন্তু আজ নিজের ভাগ্য তার সঙ্গে পরিহাস করেছে, নিষ্ঠুর সেই পরিহাস। সব হারিয়ে গেছে তার।

—এসো গো রাঙ্গাবাবু। তা ধূপ-রোদ মাথায় করে না এলেই নয়? বয়স তো হয়েছে।

রাঙ্গাবাবু ছিপটা চালায় হেলান দিয়ে রেখে পায়ে পায়ে দাওয়ার দিকে এগিয়ে যায়। ডুবির ওকথা প্রায়ই শোনে আজকাল, কিন্তু রাঙ্গাবাবু না এসে পারে না। সব গেছে তবু ডুবিকে চোখের দেখা না দেখে থাকতে পারে না।

হাসে রাঙ্গাবাবু। লাল মাড়ীটাই বের হয়ে আসে, দাঁত কটা অবশিষ্ট নেই। কবে ঝরে গেছে ওখান থেকে।

—একটু তামাক সাজ ডুবি। ঘরে মন টেকে না, তাই চলে আসি।

ডুবি কথা বলে না, চালের বাতা থেকে হুঁকোটা নামিয়ে তামাক সাজবার আয়োজন করে। তারও বয়স হয়েছে। নিটোল দেহে এসেছে ভাঙ্গন; মাথার চুলে পাক ধরেছে। মনে সেই আগেকার রংও আর নেই, সেই দিনের দেখা রাঙ্গাবাবুও বদলে গেছে। পাল্কী, বেহারা, কাছারি, আমলা-ফৈলার দলও কোথায় মিলিয়ে গেছে। আজ সব হারিয়ে গেছে তার।

আজ ফোত হয়ে গেছে সে। ছোট তরফের ছেলেরা চাকরী করে। আর বুড়োরা শেষ দিন গোনে ভাঙ্গা ইটখসা ওই ধ্বংস পুরীর অন্ধকারে। সেদিন এই ডুবিকে রাঙ্গাবাবুই সব দিয়েছিল, ঘর বাড়ী—কয়েক বিঘে চাকরাণ জমি, টাকা কড়ি। এই আখড়াও গড়ে দেয় রাঙাবাবু।

আজ ওকে দেখে ডুবির মনের কোণে জাগে একটু সমবেদনার গাঢ় ছায়া। হাতে হুঁকোটা তুলে দিয়ে বলে সমবেদনার সুরে

—না, না, এমনই বলছিলাম। তা আসবে না কেন? তাই বলে এ রোদে আসো, বয়স হয়েছে তো।

রাঙ্গাবাবু কথা বলেন—হাতে খোল, ভাতের টোপ মাথার গন্ধ, তামাকের কড়া গন্ধের সঙ্গে মিশে কেমন চিমসে হয়ে ওঠে। অতীতের দিনগুলোর সন্ধান করে রাঙ্গাবাবু এর দিকে চেয়ে। বহু পূর্ণতার দিনের সঙ্গী ওই ডুবি। সবাই চলে গেছে, শুধু তারা তুজন এখনও টিকে আছে, রাঙ্গাবাবু আর সে।

ডুবি এনে দেয় একটা কাঁসার গেলাসে করে খানিকটা তুধ।

ডুবির একজনকে ঘিরে এই নীরব আদরটুকু অনেক দিনের অভ্যাস। কেমন যেন মন চায় এমনি করে ওকে আদর যত্ন করতে। লোকটার মনের মধ্যে আছে অপরিসীম একটা হতাশা। তাই হয়তো ডুবির মত মেয়েকেও ভালবেসেছিল।

—নাও, আফিমের সময় হয়েছে না? ডুবি ওর ধাত চেনে।

রাঙ্গাবাবু কি যেন ভাবছিল। ডুবির কথায় মেরজাই পকেট থেকে গ্রামোফোন কোম্পানীর পিনের রং চটা ছোট্ট কৌটা বের করে মটরের মত ছোট্ট একটা দানা পাকাতে থাকে।

তুজনে চেয়ে থাকে দূর নীল নির্জনে, অতীতের হারাণো দিনগুলোরই বোধ হয় খোঁজ করে। কেমন যেন সব খাঁ খাঁ করছে অবেলার রোদের মত।

রাঙ্গাবাবু বলে ওঠে—হাঁরে পুষ্পর খোঁজ পেয়েছিস?

কেমন যেন মায়া পড়ে গেছে তার উপর। ডুবি বলে—আছে অম্বল গাঁয়ে রেণু গোঁসাইয়ের আখড়ায়, এসে পড়বে এইবার।

পুষ্প কোন বুড়ো গোঁসাইকে মালা চন্দন করার পর, মা বাড়ীতে ফিরতে না ফিরতেই তেরাত্রি পার করে উধাও হয়। সময়মত ফিরে আসে আবার পাঁচগাঁয়ের হরিসাগরের ধারে ছায়াঘন সেই আখড়ায়। দিন কয়েক জিরিয়ে আবার বের হয় ডুবি বোষ্টমী অন্য কোথাও মেয়েকে থিতু করবার চেষ্টায়; অবশ্য কড়া নির্দেশ আছে পুষ্পের উপর—আমার মেয়ে যদি হস, তে-রাত্তির পোহাবে না, সটান ফিরে আসবি আবার গাঁয়ে, বুঝলি।

আসেও তাই। এতাবৎ কথার নড়চড় হয়নি। আজও তাই ফিরে এসেছে সে। এই কদিনের অবকাশে মনের দৈন্য নোতুন করে দেখা দেয়। কি পেয়েছে পুষ্প এতদিন। এমনি মনের শূন্যতায় ফাঁকে—এমনি হতাশার সুরের আকাশে।

এই আনাগোনার মাঝে হঠাৎ আজ জগনকে দেখে ফেলেছে পুষ্প। কেমন যেন বিচিত্র একটি অনুভূতি। গুনগুনিয়ে ওঠে পুষ্পের শূন্য মন। অনেক খুঁজেছে তবু পথ পায়নি সে। শূন্যই রয়ে গেছে তার বুক। মাঝ পথে পরিক্রমা ব্যর্থ হয়েছে। ভালবাসা পায়নি—ও জিনিষ দেয়নি কেউ তাকে। বলে ওঠে পুষ্প—হা করে দেখছো কি গো! চল আখড়ায় গিয়ে বসবে। না মানা আছে ?

—না, না।

জগনের ব্যাকুল মন কেমন যেন একটা সুখস্পর্শের সন্ধান পায়। আঁধারে ডুবে আসছে শ্যাম-ছায়াঘন দিন, সবুজ নেশা-লাগা পৃথিবী, কল্লোল মুখর নদী তীর। সব ঢেকে গেল একাকার হয়ে। আকাশে ছড়িয়ে পড়ে কার এলো কালো চুল, জেগে আছে মাত্র তার স্তব্ধ চাহনি ওই তারার দীপ্তিতে।

জগনও কেমন যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলে আজ, পুষ্পের কাছে এসে। চলেছে তারা দুজনে তারাজ্বলা আলোয়।

পুষ্পই যেন তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে কোন অখণ্ড শান্তি আর চরম পাওয়ার দেশে।

জগনকে প্রথম চিনেছিল পুষ্প সে আজ বহুদিন আগে। ওদের পাড়াতেই খেলতে আসতো জগন। কলকে আর কেয়াফুলের প্রহরা ঘেরা নির্জন জায়গাটায় কেমন থমথমে হয়ে থাকতো বাতাসে। চাপ চাপ সবুজ ধারালো পাতার ডগে সুগৌর ফর্সা কেয়াফুল উঁকি মারে। ওরই মাঝে পুষ্পকে দেখাতো তেমনি একটি রহস্যময়ীর মতই। ডুবির পরিচয় কারো অজানা নয়। তার ঘরে পুষ্পের মত অমন রূপবতী মেয়ের আসাটাও বেশ আলোচনার বস্তু। ডুবির পরিচয় গ্রামের

কারও অজানা নেই। রাঙ্গাবাবুর যাতায়াতও সকলের নজরে পড়ে। পুষ্পর অতীত ইতিহাস কেমন রহস্যাবৃত, জগনের তাতে কোন বাধা হয়নি। জগন মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতো ওর দিকে। বাপের বেটী। মাঝে মাঝে সবে বের হচ্ছে বাবার সঙ্গে; হাত পাকাতে সুরু করেছে কাঁচা পয়সাও পায় বেশ কিছু। মেলার ওই আবহাওয়া, আর কাঁচা পয়সা তার মনে কেমন মাতন আনে।

তারই প্রতিবিম্ব দেখে জগন তার ব্যবহারে। মনের মধ্যে অন্যমন কেমন জন্ম নিচ্ছে, পুষ্পকে তাই আরও কাছে পেতে চায় সে, এগিয়ে যায় ওর দিকে তার বেপরোয়া মন দুর্নিবার ঝড়ের বেগে!

পুষ্পকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে ওর স্বপ্ন সাধ। প্রথম যৌবনে সেই ঢল আনে তার দেহ মনে দুরন্ত দুর্বার বাঁধভাঙ্গা সেই বন্যা। পুষ্পও অবাক হয়ে যায়, তার নিজের মনে কেমন একটা ঝড়ের সংক্রমণ। পুষ্প জেগে উঠেছে নব চেতনায়।

জেগে ওঠে কামনাময়ী সেই নারী। কি যেন ব্যাকুল স্বপ্নসাধ তার সারা মনে। সে আজ অনেক বছর আগেকার কথা।

তারপর বহু পথ ঘুরে এসেছে, কয়েকটা বছর চলে যাবার পরও আজ সেই প্রথম যৌবনের একটি জাগর সন্ধ্যাকে ভুলতে পারেনি ওই স্বৈরিণী পুষ্প।

জগনও কেমন হারিয়ে ফেলে নিজেকে। আজ কুমুদের কথা, তার দেওয়া এতদিনের গভীর অবহেলার ক্ষত এক নিমিষে ওর স্পর্শে ভুলে যায় জগন। তারার ম্লান আলো কাঁপে হরিসাগরের কাজল কালো জলে। কোথায় রাতজাগা পাখী একবার ডেকেই থেমে গেল। চাঁদ জেগে উঠেছে তন্দ্রাতুর ধরণীর বুকে।

জেগে আছে দুটি ব্যাথাতুর মন। কুমুদ দিয়ে গেছে জগনকে অবহেলা আর নিবিড় ঘৃণা; সারা সমাজ জীবন পুষ্পকে এনে দাঁড় করিয়েছে গ্লানির মুখোমুখি। আজ দুজনের বিক্ষুব্ধ মন একটা সুরে বেজে ওঠে।

পুষ্প অবাক হয়ে চেয়ে থাকে জগনের দিকে। দুর্মদ দুরন্ত একটা জানোয়ার যেন পোষ মেনেছে। মালা বদলের ছলে যাদের দেখেছে এতদিন তারা বৃদ্ধ, মৃত্যুপথ যাত্রী। তাদের এড়িয়ে পালিয়ে এসেছে বাববাব কি এক দুঃসহ ঘৃণায়, আজ নিজেই ধরা দেয় তাই ওর কাছে।

ব্যর্থ বঞ্চিত একটি নারী এতদিন সয়ে·এসেছে বঞ্চনা আর বিনিময়ে প্রতারিত কবে এসেছে তাদের। আজ আর প্রতারিত করতে চায় না একজনকে।

এক জায়গায় সে নিঃশেষে ধরা দিয়েছে। জগনও তাই পুষ্পকে ফেরাতে পারেনি।

ডুবি কোথায় গেছে, বোধ হয় বাবু-পাড়াব ঠাকুর দেখতেই হবে। জগন বেব হয়ে আসে প্রায়ান্ধকাব বকুলতলা দিযে। পুষ্প দাঁড়িয়ে বলে ওঠে হাসিভরা তরলকণ্ঠে—আবার দেখা হবে তো? না ভুলেই যাবে বিবিকে।

জগন হাসে। পুষ্পও জানে আসবে। বাতাসে তাই সুর জাগে।

সারা মনে জগনের একটা নোতুন সুবেব রেশ। আবার পথ পায় সে। দলের সাকরেদরা কদিনেই কেমন ঘাবড়ে গেছে ওস্তাদের হাবভাব দেখে। বাড়ীতে গেলেও দেখা করে না, ভাগিয়ে দেয় তাদের। কথাবার্তাই বলে কম। সাগরেদরা তাই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। দল ভাঙ্গনেব মুখে।

জগনের হঠাৎ এ হুঁস হয়। পরদিন গদা কামারের বাড়ী নিজেই গিয়ে হাজির হয় জগন। বিসর্জনের দিন, কামারের ছেলে জাত ব্যবসা করুক আর না করুক, বাড়ীতে হাপুর নোয়ান—কামারের শাল ঠিকই আছে। অন্যান্য ভাইরা কাজ কারবার দেখে, গদাধর অন্য ব্যবসা নিয়ে থাকে। তবু কাজের ফাঁকে গদাধর মাঝে মাঝে বসবার চেষ্টা করে শালে, কিন্তু আগুনের গনগনে তাত, আর হাফরের গরম

হাওয়ায় ওড়া আগুনের ফুলকিগুলো লোহার তপ্ত ফলাটাকে সাঁড়াশিতে ধরে হাতুড়ি দিয়ে গরম লোহাকে কায়দা করে পেটা এক মহাঝকমারীর কাজ। এদিক ওদিক হলেই বিপদ।

নিজেই বলে—কামারের কাজ কুমোরে ধরতে না জানলেই পুড়ে মরে। কোনদিন আধপোড়া হয়ে যাবো বাবা, তার চেয়ে এই ভাল। দোহাই জগন ওস্তাদের দোহাই। স্রেফ এমনি, হাত দিয়ে গুটি ফেলার কায়দা দেখিয়ে বলে—এতেই কাপড় এতেই ভাত। দরকার নেই বাবা ওসব ঝামেলায়।

সেই গদাধরও কেমন মিইয়ে গেছে আজ ওস্তাদের এই হাবভাব দেখে। বাধ্য হয়েই বোধ হয় আবার সেই বোম পোড়ানো বুক জ্বালানো লোহাকাটার ব্যবসাই করতে হবে। কামারেব ছেলে জাত ব্যবসা কবাই ভালো। সাত পাঁচ ভেবে গদাই এই পথই নিয়েছে। গদাই-এব বৌ আর ভাইবাও খুশী হয়েছে এতে। তাই বিজয়া দশমীর দিন শাল পূজো কবে খাত পাত করে বসবে টাট সাজিয়ে; টুক-টাক হাতা খুনতি, বেড়ী গড়বে; মেলায় তাই সাজিয়ে বসতে হবে চোরের মত। কেউ নিলে ভালো না নিলেও কথা নেই।

গজ গজ করছে আর হাপরের দড়ি বাঁধছে একলাই। হঠাৎ বাইরে কার ডাক শুনে চমকে ওঠে; যাকে বাব বার বাড়ী গিয়েও দেখা পায়নি, দেখা পেলেও সাড়া পায়নি, সেই জগন আজ এসেছে ওপাড়া থেকে এতখানি পথ ভেঙ্গে তার বাড়ীর দরজায়। ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পাবে না এটা। আপন মনে কাজ করে চলেছে সে।

—এ্যাই গদা। হারামজাদা কাণেও কি ঠসা হয়েছিস?

বার বার ডেকে সাড়া না পেয়ে জগন এগিয়ে আসতেই, গদা তড়পার উপর থেকে হাপরের দড়ি কসি ফেলে লাফ দিয়ে এসে পড়ে তার সামনে। চনমন করে ওঠে সারা শরীরের রক্ত, অবাক হয়ে বলে ওস্তাদ তুমি!

জগনের মুখে চোখে হাসির আভা, আবার সেই হারাণো মানুষটি

জেগে উঠেছে। এই জগনকেই চেনে তারা। জগন এগিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল।

—হ্যা রে।

গদাই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে—তাহলে নিবারণ, গুপোকে খপর দিই। কি বল ?

—আর বলে দে রায়জীবাবুদের বাড়ীতে আজই সাঁইতের আসর বসাবো।

গদাইএর মন খুশিতে নেচে ওঠে। জগনের দুচোখে সেই মন-মাতানো উল্লাসের ছায়া।

—মাইরী! গদাই তড়াক্ করে শালের তড়পা থেকে লাফ দিয়ে নেমে এসে শালের মধ্যেই পরম ভক্তি ভরে ওস্তাদের পায়ের ধূলো নিয়ে বসে।

জগনেব ডাকে বেব হয়ে এল গদাই পথে। পড়ে রইল শাল, হাপবেব বসি কসি, হাতুড়ি নেহাই। ছুটলো গদাধর ডোমপাড়াব দিকে, নিবারণ আর গুপেকে খবর দিতে। ওবা সেথো; দলেও থাকে, আবার পাহারা দেয় যাতে গোলমাল না হয়। নোতুন উদ্যমে আবার দল গড়ে ওঠে।

বিজয়া দশমীর বিসর্জনের ঢাক বাজছে। ঢাকের গুরুগর্জনে কাঁপছে আকাশ বাতাস। জগনের বুকে আজ তেমনি কলরব ওঠে, হারাণো দিনগুলোকে ফিবে পেয়েছে সে; মনে জাগে তেমনি উল্লাস। ভাগ্যকে জয় করবার প্রচেষ্টা।

—মরসুম আসছে এইবার। পূজোর পর থেকেই ক্রমশঃ জাঁকবে আসর। ধানও ভাল হয়েছে সারা অঞ্চলে। আউশ ধান উঠেছে, মাঠে রং লেগেছে। কার্ত্তিক মাস, ধানে সোনা রং। আমন ধানের পুরুষ্ট শিষগুলো এরই মধ্যে নোয়ান দিয়েছে। সু-বর্ষা—ভাল আবাদ। শুধু চাষী গৃহস্থই নয়—ব্যবসাদার, কায় কারবারী সকলেই

আশার আলো দেখেছে। এবারে সকলেই কিছু পাবার আশা রাখে।

ধান উঠবে—রাশি রাশি সোনা ধান। খামার গোলা ভরে উঠবে।

তারপরই উন্মুক্ত প্রান্তরে আমবাগানের ছায়ায় মেঠো নদী কন্দর না হয় পুকুরের ধারে অবহেলিত শিব মন্দির, অনাহুত কোন বৈষ্ণব সাধুর মঠ জেগে উঠবে মেলার কলরবে। সারি সারি দোকান পশার বসে, মুক্ত প্রান্তরে আসে জনতা, আসে গাড়ীতে করে বৌ ঝি বৃদ্ধার দল। পুরুষরা আসে মেলায়, এরাই জগনের খদ্দের। সারা বৎসরের স্তব্ধ রাত্রির নিথর নির্জ্জন নিরবতা লুপ্ত হয়ে যাবে ক'দিনের আলো আর বহু-কণ্ঠের কলরবে।

জগন তারই জন্য তৈরী হচ্ছে। তার প্রথম প্রস্তুতি হয় আজ থেকেই।

বৎসরের প্রথম দিন এইটে। আজকের বাজারের উপর সারা বছরের ভাগ্য নির্ভর করছে। তাই শনিপূজা দিয়েই তারা ছক পেতে বসেছে আজ। ক্রমশঃ ভিড় জমতে সুরু হয়েছে।

রায়জীবাবুদের বাড়ীতে বিসর্জনের পরই ওপাড়ার চুনো-পুঁটি থেকে রুই-কাতলা অনেক বাবু কর্তারাই বসেন এ আসরে। মাকে বিসর্জন দিয়ে এসে মনোদুঃখ ভোলবার চেষ্টা করেছে কারণবারির প্রসাদে। চোখ জবাফুলের মত লাল, আদ্দির গিলে-করা পাঞ্জাবী, চুনোট কাঁচি ধুতি আর চকচকে পামস্যুতে কাদা জলের দাগ—মাকে বিসর্জন দিতে গিয়ে একটু বেচাল নাচন কোঁদনও হয়েছে।

জগন বসেছে ছক নিয়ে বাবুদের দরদালানে। সেজের আলোর ম্লান পরিবেশ, ওদের জড়িত চোখের লালিমা আর বেঘোর অবস্থার মাঝে জগন স্থির হয়ে বসে গুটি চালছে।

খেলার আসরে মদ খেয়ে বসা গুরুর নিষেধ; বাবার দিব্যি দেওয়া আছে। চরম দিব্যি। এটা আজও মানে জগন।

জগনের মাথা তাই সাফ, হাত দুটো যন্ত্রের মত চলেছে। বিদ্যুৎ বেগে ছকে পড়ছে গুটি, ছয় থেকে নয়, তখনই কাঁটা থেকে

জাহাজ, জাহাজ থেকে ইস্কাপনের ঘরে; দেখ দেখ করতে করতে গিয়ে পড়ল চিড়িতনের টেকার উপর।

ক্রমশঃ হাত খুলছে জগনের। কদিন অচল থাকার পর আবার সচল হয়ে উঠেছে। বাবুরাও কায়দা করতে পারে না জগনকে।

গদাই একদৃষ্টে ওস্তাদের হাতের দিকে চেয়ে রয়েছে। সাফ হাত। বাবুরা হদিস পায় না কি যেন হচ্ছে। কিস্তের পর কিস্তে নোট হাওয়ায় উড়ে যায়। সেজবাবু জড়িত কণ্ঠে বলেন—ইয়ে টেক্কাই দিলি বাপধন।

ভিড় থেকে কে যোগান দেয়—টেক্কা নয় বাবা, একেবারে ফক্কা।

গদাই কামার অবাক হয়ে দেখে—ওস্তাদের মার শেষ রাতে। কাল পর্যন্ত যে লোকটা ছকের নাম শুনলে মারতে আসতো, আজ ছকের সামনে বসে রং নিয়ে খেলা করে চলেছে। এতগুলো ফুঁকি ঝাড়া করে দিল।

জমে উঠেছে আসর। একাই চারিদিক সামলাচ্ছে জগন। ছঘরে এক সঙ্গে দান তুলে শেষ করতে পারে না। গদাই টাকা পয়সা কুড়িয়ে চলেছে।

খেলা ছেড়ে বের হয়ে আসে পথে, তখন চাঁদ ঢলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে নারকেল গাছের আড়ালে। পথঘাট নিশুতি। কুকুরগুলো একবার ডাকবার চেষ্টা করেই থেমে গেল।

মাসী ওদের ডাকে দরজা খুলে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। জগনকে দেখতে থাকে—রাতের আবছা আলোয় ঈশ্বরদাসের মুখখানাই মনে পড়ে। জয়ের আনন্দে এমনি উৎফুল্ল হয়ে ঘরে ঢুকতো সে।

কিন্তু একটা কথা মনে করে শিউরে ওঠে বুড়ী, তার বোনের মৃত্যুর কথাটা। ঈশ্বরদাস ঘর-সংসার করতে পারে নি, বরাতে সয়নি তার।

জগনের দিকে চেয়ে থাকে বুড়ী। কুমুদের হাসি হাসি মুখখানা মনে পড়ে। কেনই বা চলে গেল সে বুঝতে পারে না।

তবু অনুমান করেছিল, জগনের স্বভাব এই বক্তের সঙ্গে মেশা নেশাটাকে কোন মতেই সহ্য করতে পারেনি কুমুদ। চেষ্টা করেছিল শোধবাবার, কিন্তু ওরা সব বাঁধনের বাইরে। যাবার সময় দেখেছিল সেই অবাধ হাসিভরা মুখে থমথমে কালোছায়া, দুচোখে জলের ভিজে দাগ।

মাসী সেই দৃশ্যটা আজও ভোলেনি। তাই সময়ে অসময়ে কুমুদকে মনে পড়ে। চোখের জল ফেলে এ বাড়ী থেকে চলে গেছে সে।

জগনের ডাকে ওর দিকে চাইল মাসী। ঘুমের জড়তা তখনও কাটেনি।

—খাবার কিছু আছে?

জগনের কথায় মাসী যেন কাঠপুতুলের মত জবাব দেয়—মুড়ি-মুড়ি কীআর নারকেল আছে। মাসীর বান্না কথাটা কেমন অসহ্য ঠেকে।

—ভাত নাই? জগনের কণ্ঠে বিরক্তির সুর।

মাসী ওর দিকে চাইল না। বলে ওঠে—না।

মাসীর দিকে চেয়ে থাকে জগন। ওর মুখে গম্ভীর একটা ভাব বিরক্তির চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বিরক্ত হয়ে ওঠে জগন—সারা-রাত খেটে এসে খাবার না পেয়ে গজগজ করে।

—থাক একঘটি জল দে, কোঁক কোঁক করে গিলে শুয়ে পড়ি। ঘর না ছাই।

মাসী ফস্ করে বলে ওঠে—ঘরের লক্ষ্মীকে আনলেই তো পারিস।

জ্বলে ওঠে জগন কুমুদের কথা উঠতে—লাথি মেরে দূর করবো তাকে। ঘরের লক্ষ্মী না আপদ।

ও এসে ইস্তক ব্যবসা মন্দাই পড়েছিল, আজ সাইথ করেছে জগন।

মোটা দান—ওদের বখরা দিয়েও নিজের ভাগে পেয়েছে কয়েকশো টাকা। জগন যেন নোতুন নেশার স্বাদ পেয়েছে।

একটা নিটোল পুরুষ্ট কামনা-মদির মুখ মনে পড়ে—বকুল গন্ধ মাখা বাতাস আবু রাত্রির তারার মত স্নিগ্ধ চাহনি। সেই অনুভূতির তুলনায় কুমুদের স্বাদ পান্‌সে ঠেকে।

পুষ্পকে মনে পড়ে বার বার। তারার আলোয় চাঁদের আলোয় মেশামেশি, বাতাসে কিসের সুর। কুমুদ মনকে তেমনি সুরে ভরিয়ে দিতে পারে না। চারিদিকে তার অসীম একটা শূন্যতা ঘনিয়ে আসে। আজ মনে হয় কোথায় যেন একটা মস্ত ভুল সে করেছে। আজ সে শোধরাতে চায়। উঠানের শিউলি গাছ থেকে ঝরছে টুপটাপ শিউলি ফুল। কোথায় একটা সুর জাগে আবার, সব যেন ফিরে পেয়েছে সে। যৌবনের সেই প্রথম স্বপ্নলাগা দিন। পুষ্পের নেশা কেমন সারা মনে একটা গাঢ় প্রশান্তি আনে। আজ জীবনের একটা মানে খুঁজে পায় পুষ্পের মধ্যে। রাতটা বড় মিঠে লাগে জগনের কাছে।

এমনি রাতে চুপ করে চেয়ে থাকে জানালার বাইরে কুমুদ। কয়েকটা দিন মাত্র এসেছে। বাপের বাড়ীর প্রতিটি গাছ পালা, পথ, গ্রামের লোক, বাল্যের কত বন্ধুর কথা মনে পড়ছে আর মন ততই হু হু করছে পাঁচগাঁয়ে বসে। জগনের কাছ থেকে যতই আঘাত পেয়েছে তত বেশী করে মনে পড়েছে ফেলে যাওয়া বাপের বাড়ীর সেই শান্তিময় পরিবেশটুকু। ব্যাকুলভাবে কাছে পেতে চেয়েছে তাদের। তাদের মাঝে সে শান্তির স্বাদ পেতে চায়।

সরে এসে জগনকে আঘাত দিতেই চেয়েছিল কুমুদ। অনুমান করেছিল, জগন একদিন ভুল বুঝবে, শুধরে নেবে সব। তাই জোর করেই চলে এসেছিল সে বাপের বাড়ী। ভেবেছিল আগেকার মত অমনিই একটা দাবী বাপের বাড়ীতে আছে, সেই ধারণা নিয়েই এসেছিল সে। কিন্তু সেই দাবীটুকু স্বামীর ঘরে যাবার দিন হারিয়ে গেছে। ক্রমশঃ এখানে এসে কেমন যেন টের পায়, এ মাটিতে আর তার কোন

শিকড়ই নেই। নিষ্ঠুর হাতে কে একটা চারাগাছ উপড়ে ফেলে পর মাটিতে পুঁতেছে। কদিনেই আবার নূতন ডালপালা গজিয়ে সেই মাটি থেকে রস আহরণ করে পর মাটিতে সজীব হয়ে উঠেছে সেই গাছটা। যে মাটি থেকে তাকে তুলে নিয়ে গেছে সেইখানে আর তার কোন স্থান নেই। সেখানকার সব সম্বন্ধ হারিয়েছে সে।

এই বাড়ীতে তার অবস্থাও ঠিক তেমনি, যেন দুদিনের কুটুম এসেছে।

বৌদি ঠাট্টা করে—এখানে কি আর মন টেকে, উড়ু উড়ু ভাব দিন-রাতই। এতই যদি মন খারাপ করে এলে কেনে তাকে ছেড়ে? ধন্যি যা হোক বাবা—ক মাসেই এত গলাগলি।

সবই যেন হালকা ফানুষের আয়ুব মত কৃত্রিমতার গ্যাসে ভরা এই আলাপ। কুমুদেব কাছে কেমন পানসে ঠেকে এসব কথা। চুপ করে থাকে আর মনে মনে কি ভাবে।

বৌদিব কথাগুলো যেন নিদারুণ পরিহাসের মতই শোনায় কুমুদের কাছে। বৌদি জানে না কুমুদের আসার কারণটা, শুনলে হয়তো অবজ্ঞা অবহেলাই করবে, ওকে ঠেলে ঠুলে বিদায় করতেই চাইবে। তাই বলতে পারে না, বলা যায় না। মা অকারণেই তাকে যত্ন আত্তি করবার জন্য অধৈর্য্য হয়ে উঠেছে। মায়ের এই ব্যস্ত সমস্ত ভাব অসহ্য হয়ে ওঠে কুমুদের কাছে। এ যেন জানান দেওয়া তুমি দুদিনের অতিথি। কাঁটা চচ্চড়ি খেতে ভাল বাসে কুমুদ, চালতার টক চিংড়িমাছ দিয়ে। আমসত্ত্ব খইচুর কবা আরও কত কি তারই যোগাড় করতে মা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ওঁর ব্যস্ততায় বিরক্ত হয়ে উঠে কুমুদ—আমি কি কুটুম এসেছি নাকি যে এত তরিবৎ করতে হবে?

এ সব অসহ্য বোধ হয় কুমুদের কাছে। মা আম-তেল মাখা মুড়ির বাটিটা এগিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বলে—আর তোকে কি রাখতে পারবো মা, দুদিনের জন্য এসেছিস চলে যাবি পরের ঘর। যে কটা দিন থাকিস একটু আদর যত্ন করি।

কুমুদ মাকে কি বলতে গিয়ে থামল। আজ নিজের কাছে নিজেকেই দোষী মনে হয়। তাদের বোঝা হয়ে যেন রয়েছে সে। মুখ ফুটে ও বলতে পারে না তার নিজের কথা। এই সব আদরটুকু তাই কেমন তেঁতো লাগে।

বাবা নিয়ে আসে সেদিন মস্ত একটা রুইমাছ। নদীর পাউসে উঠেছিল, তাই বেশী দাম দিয়েই কিনে এনেছে। ধড়াস করে দাওয়ায় মাছটা নামিয়ে গোবিন্দ বলে ওঠে—কইরে কুমুদ, মাছটা কোট। তুই আবার পাউসের মাছ ভালবাসিস তাই নিয়ে এলাম।

বাবাও যেন তাকে কি এক বস্তু ঠাউরেছে। কুমুদ একটু ক্ষুব্ধ হয়। বাবার অবস্থা সে ভালোই জানে। ওই মাছ কিনতে যে টাকা লেগেছে তার বদলে বেশ কিছু ধানই দিতে হবে। অকারণে তার জন্য এই খরচটা কেমন অসহ্য বোধহয় কুমুদের কাছে। কুমুদ বলে ওঠে—এত দাম দিয়ে মাছ আনলে কেন?

হাসে গোবিন্দ—তোর শ্বশুরের মত পুকুর তো আমার নাই, আনলাম কিনে।

চুপ করে থাকে কুমুদ। বার বার সবাই তাকে জানিয়ে দিতে চায় এ মাটিতে সে পরবাসী, দুদিনের জন্য এসেছে—যেতে হবে তাকে।

কুমুদ নিজের বেদনার কথা কোন দিনই মুখ ফুটে বলতে পারে না। গুমরে ওঠে বুকের মধ্যে একটা অসহ্য যন্ত্রণার মত সেই বেদনাটা।

হঠাৎ সেদিন আবিষ্কার করে কুমুদ তার জীবনে কি একটা রূপান্তর এসেছে। অজানা আনন্দ আর স্বপ্নের স্পর্শে শিউরে ওঠে। মাঠে মাঠে এসেছে সোনা ফসলের প্রাচুর্য্য, পুরুষ্ট ধানশিষগুলো বাতাসে পূর্ণতার আনন্দে শিউরে ওঠে শির শিরিয়ে; তারই পুলক স্পর্শে বাতাস আমন্থর।

কুমুদের জীবনে এসেছে অমনি পূর্ণতার স্পর্শ। মা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। খুশী হয়ে খবরটা পাড়ার পাঁচজনকে ঘোষণা করে।

বৌদি ফোড়ন কাটে—তাইতো বলি ঠাকুরঝির হল কি? এইবার বুঝবে। কর্তার উড়ু উড়ু ভাবও ঘুচবে এইবার। পাখীর পায়ে ঠাকুরঝি শিকল পরিয়ে ছেড়েছে।

কুমুদ কথা বলে না, খুশীই হয় সে। এইবার জগন ঘরবাসী হবে।

মা তত্ত্ব নিয়ে লোক পাঠায় মাসীর কাছে—সেই সঙ্গে পাঠায় এই সুখবরটা।

গোবিন্দ স্ত্রীর কথায় অবাক হয়। কালকের মেয়ে কুমুদ—আজ মা হতে চলেচে, নাতীর মুখ দেখবে সে। গিন্নী বলেছে।

—একবার জগনকে আসতে পত্র দিও। অনেক দিন আসেনি। আসুক একবার। সেই সঙ্গে মাসীকেও জানাও, পইলো পোয়াতি মায়ের কাছেই থাকবে। একবারে কোল ভর্তি করে গিয়ে পা দেবে ওই মাটিতে।

গোবিন্দও সায় দেয়—তাই বলে দিই। পারি তবে যাবো নিজেই একবার।

ক'মাস আরও থাকতে পারবে কুমুদ। তাছাড়া অজ্ঞাতেই মনের মধ্যে একটা দুর্বার জোর পায়, ভরসা পায়। জগনকে এইবার পাকাপাকী ভাবে বাঁধতে পেরেছে সে। দেখবে কেমন না এসে থাকে।

মাঠের দিকে চেয়ে থাকে, সোনাধানের খেতের পারে নীল মেঘে মেঘে রং-এর খেলা। নির্জন মাঠের বুক চিরে মেঠো পথটা চলে গেছে, দুপাশে আকন্দ ফুলের বন।

সেই ভ্রমরটার কথা মনে পড়ে। কাণে কাণে কি যেন গুণ-গুণিয়ে কার আসবার খবর দিয়ে গেছে তাকে ওই পথের বাঁকে। সুখবর আনে ভ্রমর।

গোবিন্দ নিজে এসেছিল সংবাদ দিতে। লোকটাকে পাঠিয়ে ঠিক যেন খুশী হতে পারেনি, কি বলতে কি বলবে। সাতপাঁচ ভেবে নিজেই বের হয়ে পড়ে একবার। ঘুরে যাবে নিজেই একবার, ওদের বাড়ী আসবে আমন্ত্রণ জানাবে জামাইকে।

কিন্তু জগনকে বাড়ীতে দেখতে পায় না। একবার তার সঙ্গে দেখা করা দরকার। একটু অপেক্ষাই করে ওদের বাড়ীতে। তত্ত্ব দেখে মাসীও আনন্দিত। পাড়ার পাঁচজনকে ডেকে, শোনায় খবরটা। মাসী খুশিতে ডগমগ। শূণ্য ঘর তার পূর্ণ হবে; পূর্ণ হবে তার বোনের বংশ। আহা, বেঁচে থাকুক ওরা, বুড়ী দেখেই আনন্দ পাবে।

গোবিন্দ বেহানকে অনুরোধ করে—একবার পাঠিয়ে দিও জগনকে।

বেহাই-এর কথায় মাসী মত দেয়—যাবে বৈকি। কালীপূজোর পরই যাবে।

জগনের দেখা নেই তখনও গোবিন্দ প্রশ্ন করে—তাকে দেখছি না যে?

মাসীর মনে যেন কু' ঠেকে। কিছুদিন থেকেই দেখছে, কুমুদ চলে যাবার পর থেকেই আবার যেন বদলে গেছে জগন। রাত করে বাড়ী ফেরে, কোন কোন দিন ফেরে বেশ একটু বেচাল অবস্থায়। ঈশ্বর দাসও ফিরতো মাঝ রাতে এমনি অবস্থায়। সেই পথই যেন ধরেছে জগন।

ঠিক ভাল বোঝে না মাসী। তবু বেহাই-এর কথায় জবাব দেয়, —কোথায় বাহিরে গেছে।

গোবিন্দ জবাব দেয় না; তার অন্য কাজ আছে, একটু সকাল সকালই বের হয়ে যায়। বার বার করে গোবিন্দ জগনকে পাঠাতে বলে একবার।

তখনও জগন ফেরে নি, কে জানে কোথায় সে।

গোবিন্দও গাঁয়ে তার কোন পাত্তা করতে পারে না, অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করেও খোঁজ পায় না। জগন যেন ঠিক সাধারণের সমাজের বাইরে। তাই তার খোঁজ এরা রাখে না।

পথ চেয়ে থাকে কুমুদ। ভেবেছিল বাবার সঙ্গেই আসবে

জগন খবরটা পেয়ে ; জানালার বাইরে সোনা ধানের ক্ষেতের বুক চিরে এসেছে মেঠো পথটা নদীর দিক থেকে। সেই দিকেই চোখ রেখে বসে থাকে। কত লোক আসে যায়, আমন ধানের সোনা রংএর বোঝা মাথায় নিয়ে যায় চাষীর দল—খালের বুকে থিতোন জলে তখনও ফুটে আছে দু'একটা শ্যাপলা শালুক। দিগন্তপ্রসারী ধান ক্ষেতে হালকা সোনালী আভাষ ফুটে উঠেছে। সেই পথ দিয়ে এত লোক আসে যায় কিন্তু জগন আসেনি।

এল না। পথ চাওয়াই ব্যর্থ হয় তার। একাই গোবিন্দ ফিরে আসে। চুপ করে কথাটা শোনে কুমুদ তার কোঠার উপর থেকে।

গোবিন্দ বলে চলেছে—জগন কোথায় গেছে, দেখা পেলাম না তার। বলে এলাম বেয়ানকে পাঠিয়ে দেবার জন্য।

মা সায় দেয়—আসবে বৈকি খবর পেলে। কুমুদ কোন কথা বলে না।

ভাবে হয় তো আসবে দু'একদিনের মধ্যে। আজ কাল না হয় পরশুই।

বৈকালে সোনা রোদ ধানের ক্ষেতে ম্লান আভা আনে। ধুলো উড়িয়ে চলেছে ধান বোঝাই গাড়ীগুলো ; মাঠ থেকে ভেসে আসে গানের সুর—কেমন উদাস, বিধুর সেই সুর।

মন কেমন করে কুমুদের।

বড় বৌদি বলে—আসবে গো আসবে। এইবার না এসে পারে না সে মরদ।

কথা বলে না কুমুদ। মনে মনে ভাবে—বৌদি জানে না তার প্রকৃত স্বরূপ। বেপরোয়া, বেয়াড়া একটা মাথাঠাড়ো লোক। কি যেন আপন খেয়ালেই চলে। কোনদিকে তার নজর নেই। তার জীবনের যেন একটা দশম গ্রহ !

কুমুদের মন কেমন করে। কেমন যেন একটা অজানা ভয় হয়।

ভয় একা কুমুদেরই নয়, ভয় পেয়েছে ডুবি বোষ্টমীও। তার মত চলনবাজ এলেমদার মেয়েও কেমন যেন প্রমাদ গুণছে হঠাৎ এই ব্যাপার দেখে। জীবনে অনেক কিছু দেখেছে ডুবি। তার একদিন রূপ যৌবন ছিল। তার তুফানে কেমন করে মানুষ সব বাঁধন ছিড়ে উধাও হয়, তা ভাল করেই জেনেছে সে।

পুষ্পকে এতদিন যে মন্তর দিয়ে এসেছে সেই ঘর না বাধার মন্ত্র, বাউলের দেহতত্ত্বের বিকৃত ধোকা আজ পুষ্পের কাছে অসার বলে মনে হয়। ঘাটে ঘাটে শুধু ভেসে বেড়ানো আর নয়, থিতু হতে চায় সে, ঘর বাঁধতে চায় তার উড়ু উড়ু মন। সব হারিয়ে পথে পথে বেড়ানো আর নয়—নিঃশেষে একজনকে আপন করে পেতে চায় পুষ্পের সারা মন। এ পাওয়ার যেন শেষ হয় না।

ডুবি পুষ্পের মাঝে দেখেছে সেই ঘর-বাঁধার সত্যিকার সাধ। এতদিন হয়তো মনের মানুষ পায়নি তাই ডুবির মতেই মত দিয়েছে। এঘাট থেকে ওঘাট ভেসে ভেসে ফিরেছে। কিন্তু দুর্বার জগনের মাঝে আজ পুষ্প নোতুন কোন আশার স্বপ্ন দেখে। ডুবি তাই শিউরে উঠেছে।

জগনও হঠাৎ দুর্বার গতিতে এগিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়েছে। পথের বাঁকে তার অজ্ঞাতেই তার জন্য যে এমনি অমৃত সঞ্চয় ছিল, জানত না সে। কুমুদকে পাওয়া তার কাছে অতি সাধারণ পাওয়া পুষ্পকে পাওয়া অনেক কষ্টের, অনেক সাধনার। তারই চিন্তায় আজ মত্ত সে।

মেলার আলো কোলাহল মুখর পরিবেশের মধ্যে বাজির ছকে দুরু দুরু বুকে দান পেতে গুটি পড়া, দান পড়েছে তার। ছোট, মাঝারি, বড় দান। দুহাতে পয়সা তুলছে সে।

জগন স্বপ্ন দেখে, টাকার স্বপ্ন। বেশ কিছু টাকা রোজকার করে তারা দুজনে ঘর পাতবে।

তারই স্বপ্নে আজ বিভোর হয়েছে জগন। এখানে নয়, অন্য কোনখানে।

পুষ্পও বলে ওঠে,—সেই ভাল। মায়ের এখান থেকে চলে যাবো আমরা।

জগন এখন নদীর ধারে আখড়াতেই প্রায় আসে কি এক দুর্বার আকর্ষনে। নিজেকে যেন ভাসিয়ে দিয়েছে পুষ্পের রূপের স্রোতে। আবার নোতুন উপকূলের স্বপ্ন দেখে সে।

আবছা অন্ধকারে জগন চেয়ে থাকেওর দিকে। পুষ্পের মাথার কালো চুলে আঁধার নেমেছে ; জেগে আছে ওর দীপ্ত চাহনি। বলিষ্ঠ দেহের নিটোল পূর্ণতা যেন নদীর কালো হিম জল গ্রীষ্মের তাপে দগ্ধ পথিককে শান্তির আমন্ত্রণ জানায়। আকাশে ফুটে উঠেছে দু'একটা তারা, নদীর জলে তাদের আভা কাঁপে। শ্যামছায়াঘন অন্ধকারের পারে যেনকোন শান্তির নিশানা ভরা প্রদীপ জ্বলছে। পুষ্প ওর দিকে চেয়ে থাকে।

গদাই এসে ডাক দেয়—ওস্তাদ!

কালীপুজোর রাত্রের আসর তৈরী। আজও চলবে সারারাত জুয়ার দান পড়ন। পাঁচগাঁযের বুকে লোভী হাতের পাঞ্জা এসে পড়েছে। কয়েক ঘর শেঠ, মাড়োয়ারীও এসেছে। রাখি কারবার, ধানকল তৈরী করে বসেছে। তাদের সাইথের দিন। মোটাদান আড়ে তারা। আজ তারাও আসরে আসবে। গদাই-এর ডাকে জগন সচকিত হয়ে ওঠে—এখানে এলি কি করে?

হাসে গদাই বোকার মত। সেও টের পেয়ে গেছে ওস্তাদের নোতুন আস্তানার। এখানে ওখানে আর যাবার দরকার নেই, এক জায়গাতেই পাওয়া যাবে তাকে।

—এলাম, ঘুড়ি লাটাই একত্তরই থাকবে কিনা। কি বলো গো?

কথাটা পুষ্পের উদ্দেশ্যে। পুষ্প মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসছে খিল খিলিয়ে, সারা দেহে যেন বন্যা প্রবাহ নেমেছে। মিষ্টি সুরে বলে ওঠে—মরণ, যেমন গুরু তেমনি চ্যালা।

জগন উঠতে যাবে, বাধা দেয় পুষ্প—বারে, না খেয়ে যাবে!

উপোস দেবে সারা রাত। একটু বসো, দেখি খাবার কি আছে।

এ যেন অন্য কোন সেবাপরায়না নারী, একটু আগেই সারা মনে যে কামনার ঝড় তুলেছিল, সেইই আরাব সেবার স্নিগ্ধতায় জগনের মন ভরিয়ে তোলে মধুর কি এক বিচিত্র স্বাদে। চলে গেল সে। গদাইও উঁবু হয়ে বসেছে দাওয়ায়। ওস্তাদের দিকে চেয়ে বলে ওঠে—মাইরী, বেশ জুটিয়েছো যা হোক।

জগন ওর দিকে চাইল কঠিন চাওনিতে। পুষ্পের সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছে। কিন্তু কই সে তো তেমন প্রকৃতির সন্ধান পায়নি পুষ্পেব মধ্যে। সে কুমুদের দেওয়া ব্যথার উপর শান্তির স্পর্শ এনেছে।

—এ্যাই! ধমক দিয়ে ওঠে জগন।

পুষ্পের সম্বন্ধে কোন মন্তব্য সে আশা কবে না। গদাই ধমক খেয়ে চুপ কবে গেল।

ইতিমধ্যে পুষ্প দাওয়াতে জল ছিটিয়ে একটা থালায় এনেছে কয়েক-খানা রুটি, তরকাবী, আর একটি বড বাটিতে কবে খানিকটা দুধ।

গদাই চেয়ে থাকে মাত্র, সন্ত বকুনি খেয়ে মনটা ভাল নেই।

—নে! জগন গদাই-এর হাতে তুলে দেয় একটু তবকারি সমেত দু'খানা রুটি। গদাই দুহাত পেতে রুটিখানা নিয়ে চিবুতে চিবুতে বলে ওঠে পুষ্পকে খোসামুদের মত।

—ই-যে অমেত্ত হয়েছে গো ঠাকরণ, সগ্গের অমেত্ত।

পুষ্প হাসে। সারা শরীর দুলে উঠছে হাসির আলোড়নে। জগন গদাইকে ধমক দিতে গিয়ে থেমে গেল। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে পুষ্পের দিকে। মিষ্টি ভঙ্গীটুকু দেখে আশ মেটে না। অপলক-দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে আলো ছায়ার ওই স্বপ্নময়ীর দিকে।

ডুবি কয়েকদিন থেকেই দেখছে ব্যাপারটা, কোন কিছুই তার নজর এড়ায়নি। এইসব দেখে পুষ্পকে আর যেন বিশ্বাস করতে পারে না; বেশ বুঝতে পারে, জগনকে সে কোথায় মন দিয়ে

ফেলেছে, হয়তো জানে, না হয় অজ্ঞানাতেই ঘটেছে সেটা।

কথাটা ভেবে শিউরে ওঠে ডুবি। জানে জগনের মত দুর্মদ পুরুষ আর ডুবির মত গড়ানো পাথর যখন একটাই হয়, তখন তাদের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কারোও নেই।

ডুবির ব্যবসা ডুবে যাবে মেয়ে যদি বেঁকে বসে। ওই তার বর্তমান মোটা রোজকারের পথ। কোথায় আবার কোন বৃদ্ধ বাবাজীকে ঠিক করেছে, নগদ পাঁচশো টাকা দেবে মালা-চন্দন করিয়ে দিলে। কথাবার্তা সব ঠিক, এখন যেতে দেরী। তার সাতদিন পরই পুষ্প আবার ফিরে আসবে নির্ঘাৎ বুড়োকে ফেলে। ফাঁকতালে ডুবির পাঁচশো টাকাও পাশ বই এ জমবে। একদিন ছিল যখন রাঙ্গাবাবুর দয়াতেই সংসার চলতো, এই সব উঞ্ছ বৃত্তির দরকাব হয়নি। কিন্তু আজ এ ছাড়া আর পথ নেই। ডুবির আখড়ায় যে কয় বিঘে জমি আছে তাতে মাত্র কয়েকটা মাসের খোবাকি হয়। বাকী খবচ আছে। ডুবি তা পুষ্পকে মালাচন্দন করিয়েই যোগাড় কবেছে। কিন্তু কোথায় যেন সব বদলে যাচ্ছে।

আজ বাঙ্গাবাবুই একটা বোঝা। ফেলতেও পাবে না—গিলতেও পাবে না। সেই-ই যেন তার পোষ্য। ডুবিব মায়া পড়ে গেছে তার ওপর, হাজার হোক পুরোনো কালেব মনের মানুষ। একটা রং এখনও আছে ডুবির মনে। কদিন থেকে একটু কবে দুধ তাও দিতে পাবেনি তাকে। বৈকালে আফিমেব মৌতাতের সময় এক গেলাস দুধ প্রাপ্য রাঙ্গাবাবুর। এ ক'দিন পুষ্পই দুধ গরম করে। সেদিন বলে ওঠে পুষ্প—জগনের জন্য দুধটা বইল মা। ওটা থেকে কাউকে আর দিও না। সারা দিন খেটে খুটে আসে লোকটা। তাছাড়া দুধের দাম ও সে দেয়।

পুষ্পের দিকে চেয়ে থাকে ডুবি। কথা বলতে পারে না। ওর কথায় কি যেন ভাবছে। সেদিন দুধটুকুর বদলে রাঙ্গাবাবুকে এক

কাপ করে চা ধরে দেয়। আমতা আমতা করে ডুবি —দুধও টেনে গেছে গরুটার।

রাঙ্গাবাবু অসহায় দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থাকে। রোজকার মত ছিপ রেখে এসে বসেছে ডুবির চালা ঘরে, চুপ করে ডুবির অভাবের কথাটা শোনে। করবার কিছু নেই আজ, রাঙ্গাবাবুর গোয়ালও শূণ্য, না হলে আর একটা দুধেল গরুও এসে পড়ত তা জানে ডুবি। বৃদ্ধ চুপ করে থাকে, অভাবটা সেও অনুভব করে। বলে ওঠে রাঙ্গাবাবু —তা তুই আর কি করবি। চাও মন্দ নয়। আজকাল তো সবাই এই খায়। কোন রকমে চায়ের কাপটা ধরে চুমুক দেবার চেষ্টা করে রাঙ্গাবাবু।

ডুবি অনেকগুলো ছোট ছোট ঘটনা দেখেছে পুষ্প কেমন আমূল বদলে গেছে। ওর মনে ঘর বাঁধবার দুর্বার নেশা। কিন্তু ডুবি জানে দুঃখ একদিন পাবে পুষ্প। তাই হয়তো সে রাত্রে পরিস্কার করেই কথাটা পাড়ে মেয়ের কাছে।

জগন আর গদাই চলে গেছে; অমাবস্যার গাঢ় আঁধার নামে আকাশে বাতাসে। সব তারা যেন ঢেকে গেছে। একক নিরন্ধ্র অন্ধকারে জ্বলছে ম্লান আলো; নদীর দিক থেকে আসে শোঁ শোঁ বাতাস—আখড়ার বকুল গন্ধ স্নাত হয়ে বিভোর স্বপ্ন মুখর।

ডুবি বলে ওঠে—জগনকে কেন নাচাচ্ছিস। বেয়াড়া বেবশ লোক। সব পারে ও। তাছাড়া বিয়ে থা করেছে, ঘর সংসারী মানুষ।

পুষ্প হাসে। ডুবি অবাক হয় পুষ্পের মুখে হাসির আভা দেখে। মায়ের কথাটা মোটেই যেন কানে তোলেনি। ওর কথাগুলো ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে চায় গায়ে পড়া খড় কুটোর মত। হাসি থামিয়ে পুষ্প বলে ওঠে—তোমার গোঁসাই কি বলতো মা? তারা কি দেবতা? পরশ পাথর খুঁজতে সব পাথরই ঠুকে ঠেকিয়ে দেখতে হয়, কোনটায় সোনা হল মন পরাণ।

ডুবি মেয়ের কথায় অবাক হয়ে যায়। হাসছে পুষ্প, ডুবি বলে ওঠে—লজ্জা লাগে না তোর, হাসছিস বেহায়ার মত। কোনদিন ওই মানুষদের কাউকে ভালবেসেছিস ?

পুষ্প বলে—এতদিন তো সেই খোঁজাই খুঁজেছি তোমার ওই বুড়ো হাবড়া বাবাজী গোঁসাইদের আখড়ায়, দেখলাম সবই শুধু পাথর। হঠাৎ পথের ধারেকুড়িয়ে পেলাম জগনকে—দেখলাম, পরশ পাথর আমার সেই-ই গো।

রাতের তারা জ্বলছে হরিসাগরের কালো জলের বুকে, হু হু জোরেলা বাতাস বয় নদীর দিক থেকে। গভীর রাত্রির তমসায় দুটি নারী আজ অন্তরের নিবিড় সত্যকে চকিতের মধ্যে প্রকাশিত করেছে।

ডুবি অবাক হয়ে চেয়ে থাকে মেয়ের দিকে। আগুন জ্বালা রূপ তার, আর হাসির ধারায় ছুরির ঝলক। নিজেই যেন ভয় পায় ওর ওই রূপ আর যৌবনকে। গজগজ করে—নদীর জলে ডুবে মরগে মুখপুড়ী।

মুখপুড়ী তবু হাসে—নদীর জলে কেন মা—নয়ন জলেই ডুব দেব শেষমেষ।

—তাই ডুববি তুই পুষ্প। ওই মেয়েকে আর কি বলবে ডুবি। বেবশ বেপরওয়া ওই জগনের কাছে থেকে শাসনের বাইরে চলে গেছে।

তখনও মায়ের কথায় হাসছে পুষ্প। ডুবি আজ চরম ঘা খেয়েছে মেয়ের কাছে।

মেলার মরসুম সুরু হয়েছে। এবার জমাট মেলা। ধান উঠেছে প্রচুর। মার ধরণ, শুকো হাজা, টান পিঠেন নেই, ধান উঠেছে লকলকিয়ে। যেমনি গাছ তেমনি শিষ। ঘরে ঘরে ধানের মরাই উঠছে। অভাব কোথাও নেই।

মেলাও তেমনি জাঁকালো হয়ে উঠেছে। গদাই, নিবারণ আগে থেকে গিয়ে বৈরাগীতলার মেলায় খেলার ঠিকে নেবার

জন্য দব-দস্তুর করে ঠিকে এনেছে। তারই খবরটা দেয় জগনকে।

সুখবব। ঠিকে নেবার দামও উঠে যাবে দুরাতেই। তারপর যা পাবে খেলোয়াড়ের। রাশিরাশি বাঁশ খড আসছে। মেলার ঘর তৈবী হচ্ছে। লোকজনের ভিড়ে ফাঁকা মাঠ, আমবাগানও ভরে উঠেছে। গদাই বলে—বিষম মেলা গো ইবার। একেবারে ফুটি সাঁকো লাইন বরাবর বসেছে। অঢেল দোকান পসাব। বাজি বাজনা, সিনেমাও আসবে শুনলাম।

আখড়ার মধ্যে একটা বকুল গাছের নীচে বসে ওদের কথাগুলো শুনছে জগন। কদিন তাকে যেতে হবে মেলায়। গদাই যাবার আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত। ওরা চলে গেছে সেইসব ব্যবস্থা কবতে।

জগন কি ভাবছে। আজ যেন পুষ্পকে ছেড়ে যেতে মন চায় না। পুষ্প চুপ করে বসে ছিল, কথাটা সেও শোনে। নাম শুনেছে বৈরাগী তলা'ব মেলার। কোন বৈষ্ণব মহাজনেব পূণ্যস্মৃতি বিজড়িত মেলা ; মেলাব চেয়ে খেলার ধূমই বেশী। তাছাড়া দিগদিগন্ত থেকে আসে সাধু মোহান্ত—দিনরাত্রি অন্ন-যজ্ঞ, মচ্ছব চলছে সমানে। জগনের কথায় কি যেন ভাবছে সে।

ঘর ছাউনি গরুর গাড়ী বোঝাই হয়ে চলছে মেলার দিকে, বেশ দিন কয়েক থাকতে হবে। জগন দলবল নিয়ে চলে গেল মেলায়। বারবার মন কেমন করে। তবু যেতে হয় তাকে।

ভুবির যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে, আপদ বিদেয় হল এবার। মেয়েটাও ভুলে যাবে ওকে। নিজের মন দিয়ে জানে ভুবি, পুষ্পের মত মেয়েদের কোথাও ধরা পড়তে মানা। পথের ধারে যেতে যেতে দেখা হল তোমার সঙ্গে দুদিনের জন্য হাসি, মসকরা, গল্পগাছা হল পথ চলতে চলতে, মনজানা চাউনিও বদল হল। পথের বাঁকে দুজনে আবার দু'দিকে চলে যাও, ব্যস চুকে গেল সম্বন্ধ! মায়ায় জড়ানো কেন? দুদিনের মায়া—চোখের নেশা শুধু দুঃখই আনে।

মেয়েরা জলের জাত, যখন যে পাত্রে রাখ সেই পাত্রেরই রূপ ধরবে। কিন্তু তার ধারণা যেন বদলাচ্ছে। জগন চলে যাবার কদিন পরই ডুবি মেয়েকে নিয়ে বের হবার আয়োজন করে। আগে থেকেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছে ডুবি। মেয়েকে নিয়ে যাবে সেখানে, মালাচন্দন করাবার আগে টাকা কটা পেট আঁচলে বেঁধে ডুবি চলে আসবে মেয়েকে রেখে। তারপর বাড়ী ফিরবার কদিন পরে মেয়েও আবার ফিরে আসবে মায়ের কাছে।

কিন্তু এবার বাধা দেয় পুষ্প—উঁহু, ঢের হয়েছে মা। উ খেলা আর নয়। এইবার ক্ষ্যামা দাও।

কেমন যেন ক্লান্তি এসেছে তার। ডুবি বলে ওঠে—সেকি! বোষ্টমের মেয়ে, মালা-চন্দন হবে না? তবে এই সব করবি?

এই প্রথম মালাচন্দন করে মেয়েকে ঘরবাসী করবার জন্য ভাবনায় পড়েছে ডুবি। আজ কথাটা সত্যিই ডুবি গভীরভাবে ভাবছে। এতদিন যা করেছে আর তা করতে চায় না। মনেমনে চায় মেয়ে থিতু হোক। কিন্তু মাকে আর বিশ্বাস করতে পারে না পুষ্প। তাই প্রতিবাদ করে এবার। পুষ্প মায়ের এই খেলা ঢের দেখেছে। ঘৃণা ধরে গেছে তার। প্রতিবাদ জানায়—না, আর যাবো না।

ডুবি চটে ওঠে—তবে কি করবি?

পুষ্প সহজভাবেই জবাব দেয়—বলেছি তো গো, লয়ন জলে ডুবে মরবো ইবার।

হাসে পুষ্প। ডুবি চেয়ে থাকে ওর দিকে। মনে মনে জ্বলছে মেয়ের কথায়। পুষ্প কাপড় চোপড় গোছ গাছ করে।

কোথায় যেন যাবার জন্য তৈরী হচ্ছে পুষ্প। ডুবি শেষবারের মত কড়া স্বরে বলে ওঠে মেয়েকে—ইখানে থাকতে গেলে আমার কথা শুনতেই হবে। মালাচন্দন দোবই তোর।

পুষ্প তবু মায়ের দিকে ফিরে চাইল না।

ডুবি গলা নামিয়ে চুপি চুপি বলে ওঠে—যেন কথাটা পাঁচকাণ না

হয়। এ বর ভালো রে। বুড়ো হাবড়া নয়; তুই আর অমত করিস না পুষ্প।

পুষ্পের অফুরান রূপের দিকে চেয়ে থাকে ডুবি। মাথার চুলের রাশ চুড়ো করে বাঁধা। কি যেন চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে মায়ের মন।

অনেক ভেবে দেখেছে পুষ্প! যতই ভেবেছে ততই দেখেছে তার আগেকাব জীবনের সব ব্যর্থতার গ্লানি আর হতাশার অন্ধকার। চেষ্টা কবেছে ঘর বাঁধার, নিজেকে সুখী করবার। কিন্তু যাদের এতদিন চিনেছে সে—সেই আখড়ার বাবাজী গোঁসাইদের—দেখেছে সবাই ফাঁকির ফানুস। উপরে ধর্মের ভেক নিয়ে অন্তরে কোন পঙ্গু শয়তানকে পুষে রেখেছে। তাদের মানিয়ে নিতে পাবেনি তেজস্বী ওই মেয়েটি, তাই চলে এসেছে তাদের পিছনে ফেলে।

ডুবি ওর এই স্বভাবজাত তেজটুকুর সুযোগ নিয়ে বারবার কিছু টাকা বোজকার কবেছে।

শূন্য ব্যর্থ বঞ্চিত রয়ে গেছে পুষ্পের মন, তাব সারা অন্তর। আজ তাই জগনকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে সে। এতদিন যেন অমনি একটি তেজস্বী বেপরোয়া মানুষই খুঁজছিল সে, যাকে জয় কবে আনন্দ পাবে। যাকে আপন কবে তৃপ্তি পাবে।

মায়ের আজকের কথাগুলো তাই আজ উড়িয়ে দিয়েছে পুষ্প। জানে মা রাগ করেছে, কিন্তু আজ আর এমনি করে নিজেকে হাটে হাটে পশরার মত বিক্রী করতে নারাজ।

কদিন থেকে মনটা কেমন হু হু করে। দিনের অধিকাংশ সময়ই কাটতো জগনের সঙ্গে। বকুলতলায় বসে থাকতো জগন। পুষ্প মাঝে-মাঝে গুণ গুণিয়ে উঠতো সুরেলা কণ্ঠে। জগনের মত মানুষ ও আনমনা হয়ে যেত সেই সুরে। হাসত পুষ্প—তোমার কি হল বল দিকি ওস্তাদ। হাসে জগন।

কদিন বৈরাগীতলার মেলায় চলে গেছে সে। পুষ্প কি ভেবে

যেন সেইখানেই যেতে মনস্থ করে। মাত্র কয়েক ক্রোশ পথ, কাঁচা সরক ধরে গেলেই পড়বে মেলা। কতলোকই যায়, জগনকে সেখানে ও খুঁজে নেবে। মন কেমন করে ওঠে পথের স্বপ্নে—অনেকদিন বের হয়নি। আজ তাই কিসের টানে পথেই বের হয়ে পড়ে।

মাকে কোন কথা না বলেই বের হয়ে এসেছে পুষ্প। বিরাট মেলা, দূর থেকে বাতাসে ভেসে আসে মেলার কলরব আর কোলাহল, লাখো কণ্ঠ যেন একাকার হয়ে একটি মহাধ্বনিতে পরিণত হয়ে আকাশ সীমা ছেয়ে ফেলেছে। কানে আসে দূর থেকে কত বিচিত্র সুরের রেশ। কাছে আসতে শব্দটা পৃথক পৃথক হয়ে ধরা পড়ে।

বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে মেলার দোকান পসার বসেছে। যেন ছোট খাটো একটা সহর। যতদূর যাও কেবল মানুষ আর মানুষ। বিচিত্র মানুষের ভিড়।

সারি সারি দোকান। মনোহারী দোকান তার পটিই আলাদা, হাড়ি কড়াই লোহা লক্কড়ের সারিও তাই; মাতুর, সপ, পাটি তাও হেলাফেলা। খাবারের দোকানেরও সীমা সংখ্যা নেই, তারপর বাসন-কোসন, চায়ের দোকান তো এখানে সেখানে ছড়ানো আছেই। বাগানের সীমা ছাড়িয়ে মাঠের দিকে বেড়ে গেছে দোকান পশারের আয়তন। ওদিকে এসেছে দিকদিগন্ত থেকে বৈষ্ণব, বাউল সহজিয়াদের দল। মন্দিরের সামনেই অন্ন-সত্র চলেছে। ভাতের স্তূপ, কয়েকটা চৌবাচ্চায় ডাল ঢালা হয়েছে। একপাল কুকুর অনবরত তার দিকে চেয়ে রাশিকৃত এঁঠো পাতার জঙ্গলে মারামারি করতে করতে এসে ছিটকে পড়ল ডালের চৌবাচ্চায়; সাঁতার দিয়ে ওপারে উঠে গা ঝাড়া দিতে দিতে দৌড় মারে পলাতক সৈনিকের মত। লোকজনেরা হৈ হৈ করে ওঠে।

ওদিকে হাজারো লোক খেতে বসেছে; ডাক হাঁক নেমতন্ন নেই। পাতা টেনে নাও আর বসে পড়ো।

ওই ভিড়ের মাঝে ঘুরে বেড়ায় পুষ্প। চারিদিকে তার সন্ধানী দৃষ্টি।

কোন গোঁসাই রসিকতা করে বলে ওঠে—কোন গোঁসাইকে খুঁজছো গো, কলসী কাঁখে শ্রীরাধিকার মতো?

ওর কথায় থমকে দাঁড়াল পুষ্প। বৃদ্ধ যেন আচমকা তার মনের গোপন কথাটাই ধরে ফেলেছে। কেন সে মেলায় এসেছে কিসের সন্ধানে, তা তো মিথ্যা নয়। এসেছে কি এক দুর্বার আকর্ষণে—নোতুন করে তার জগনকে খুঁজে পেতে।

বুড়োর দু'চোখে স্তিমিত দৃষ্টি। পুষ্প জবাব দেয় হাসতে হাসতে—মনের মানুষকে গোঁসাই।

—পেলে সখি? বুড়ো রসিকতা করে বলে।

পুষ্প একটু যেন নিরাশ হয়েছে। জবাব দেয়—কই আর পেলাম। যে ঘাটেই যাই কলসী ভরতে, দেখি জল কোথাও নেই—যে জলে তেষ্টা মেটে। থিক থিক করছে শুধু পোকা ভর্তি কাদায়, তাই কলসী আমার শূন্যই রয়ে গেল। ভরা আর হোল কই বাবাজী!

বৃদ্ধ আর ক'জন বাবাজী ওর দিকে চেয়ে থাকে। পুষ্প চলে গেল এক ঝলক সৌরভ মদির হাওয়ার মত। ভিড়ের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেল সে।

প্রায়ান্ধকার গাছতলায় হঠাৎ একটা সুর কানে আসে। ঘরছাড়া বাউলের জমায়েৎ। সন্ধ্যার অন্ধকার মেলার দিকে আলোয় ভরে উঠেছে। আলো আর প্রচণ্ড কোলাহল, ব্যাণ্ডের সুর, সিনেমার লাউডস্পীকারের গর্জনে চারিদিক ভরপুর। তারই বাইরে নির্ম্মল অন্ধকারে উঠছে মধুর সুরটা।

এখানে আলো নেই, আছে একতারার রিণি রিণি সুরে কার সুরেলা গলার সুরটা। থমকে দাঁড়াল পুষ্প। একটি মেয়ে গান গাইছে। আবছা আলোয় স্পষ্ট দেখতে পায় না তাকে। দেহের আভাসটুকু মাত্র পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সুরময় সেই মূর্তি, দু'চোখে তার কোন আনন্দলোকের স্বাদ।

সন্ধ্যার ম্লান আলোয় একটি সুর তার মনে যেন ঝড় তোলে।

পুষ্প দাঁড়িয়ে পড়ল গাছতলায় ওদের দৃষ্টির বাইরে। একাই দাঁড়িয়ে আছে সে, সুরটা কানে ভেসে আসে—শান্তির নিবিড় স্পর্শ যেন তার উত্তপ্ত মনের উপর একটা স্নিগ্ধতার ছায়া আনে।

আমার যেমন বেণী তেমনি রবে
চুল ভিজিবে না।
আজি জলে নামব, জল ছিটাবো
তবু বেণী ভিজবে না॥
ইধার উধার সাঁতার পাথার
করি আনা গোনা।
আমি নাহি রব সতী না হব অসতী
তবু তো পতি ছাড়বো না।

সুরটা পুষ্পের অবচেতন মনে কেমন যেন একটা মুক্তির নির্দেশ আনে। আনে সব চাওয়া পাওয়ার ব্যাকুলতার উর্দ্ধে একটি পরিপূর্ণ মুক্তি, আর স্তব্ধ কামনার প্রান্তে অসীম শান্তির সন্ধান।

ঘাটে ঘাটে ফেরা কামনার দীপ জ্বেলে শত ঝড়ের গর্জন এড়িয়ে পথচলার ক্লান্তি আজ চকিতের মধ্যে পুষ্পর মনের দুরন্ত কাঙ্গালপনার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। নিজের উপরেই আসে ঘৃণা। কেন যে আজ তিনকোশ মাঠ ভেঙ্গে সে ছুটে এসেছে মেলায়—কাকে খুঁজতে, নিজেই জানে না। জগনকে দেখতে এসেছিল—তাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসেছে সে এইখানে।

নিজের উপর আসে দুঃসহ লজ্জা। রূপ—কার রূপ দেখে মজেছিল? আজ নিজেকে পথে নামিয়েছে ভেবে সে শিউরে ওঠে।

নিজের দিকে চায়নি, চেয়েছে অন্যের দিকে। অপরকে ভালবেসে নিজেকে ফুরিয়ে দিতে গিয়ে আজ যেন নোতুন করে অফুরন্ত সেই নিজেকে আবিষ্কার করেছে পুষ্প।

জোনাকজ্বলা ম্লান অন্ধকারে শিউরে ওঠে সে। মেয়েটির সুরেলা নিভাঁজ কণ্ঠস্বর স্তব্ধ আকাশের অসীমে বিলিন হয়ে যায়।

মেয়েটির গানে কি যেন যাদু আছে। দাঁড়িয়ে পড়েছে পুষ্প। গানটা উৎকর্ণ হয়ে শোনে। রাতের বাতাস বইছে, বাতাসে বাতাসে সেই সুর।

কি রূপ দেখলাম রে,
আমার মাঝত বাহির হইয়া
দেখা দিলেক আমাকে॥

আজ নিজের মনের এই রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছে সে। জগন—আরও কতজন—সবাইকে যেন ভুলে গেছে সে।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল জানে না, ওরাও তাকে দেখছে বিস্মিত চাহনিতে। পুষ্পের মাথায় চুড়ো করে একবাশ চুল বাঁধা, টিকলো নাকে রসকলি। ওরা চেয়ে রয়েছে তার দিকে।

হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে সরে এল পুষ্প সেখান থেকে। পায়ে পায়ে মেলার দিকে এগিয়ে যায়; অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। মনের সেই নীরব কান্না তার নিজের কাছেই অসহ্য ঠেকে। তাই যেন নিজেকে ভুলতে চায় সে এখান থেকে সরে গিয়ে—জনতা আর কোলাহলের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে। আনমনে পুষ্প চলেছে, যেন পালাতে চায় এখান থেকে।

—তুই এখানে ?

হঠাৎ যেন সাপ দেখেছে পুষ্প। ওর ডাকে তাই চমকে ওঠে। দেখা না করেই যাকে এড়িয়ে পালাতে চেয়েছিল সেই জগনই এসে হাজির হয়েছে তার সামনে।

এ জগনকে যেন চেনে না পুষ্প।

পরণে আদ্দির পাঞ্জাবী, পায়ে পামসু, ধোয়া পাট ভাঙ্গা ধুতি। কেমন যেন ওই চেহারার দিকে বিভ্রান্তের মত চেয়ে থাকে পুষ্প।

জগন ওকে দেখে খুশীতে ফেটে পড়ে।

—কি রে বাক্যি বন্ধ হয়ে গেল নাকি?

এগিয়ে আসছে জগন। দুচোখে তার তৃপ্তির আভাস। কেমন যেন গুণগুণ সুর ওঠে মনে। মেলায় এসে রোজগার করেছে প্রচুর, তাই পুষ্পকে দেখে আজ খুশীতে উপচে পড়ে।

পুষ্প হাসবার চেষ্টা করে, মন থেকে ঝড়টা মুছে ফেলতে চায়। জগনের মনের ওই খুশির যোয়ারে তার সবকিছু বাধা চিন্তা যেন ভেসে যাচ্ছে ক্রমশঃ।

আবার পুষ্পের মুখে ফুটে ওঠে হাসির আভা, দুচোখে তার কামনার আভাষ। স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে ওঠে—না তোমাকে দেখছি। ই যে জামাইএর সাজগো।

পুষ্পের হাতখানা ওর হাতে। জগন হাসে—তুইওতো কম সাজিস নি। নাকে আবার রসকলি। দুচোখে কাজল!

পুষ্প জবাব দেয়—যি পূজোর যি মন্তর। আবার হাসে পুষ্প।

তাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলে জগন। কয়েকদিন বেশ রোজগার করেছে। দানও উঠেছে প্রচুর। মেজাজ তাই ভালও রয়েছে। আজ আসরে বসেছে গদাই, নিজে মেলা বেড়াতে বেরিয়েছিলো। বেরিয়ে ভালই করেছে সে। হারাণো-মাণিক খুঁজে পেয়েছে সে। জগনই আমন্ত্রণ জানায় পুষ্পকে—বাসায় চল।

অবাক হয়ে চারিদিক দেখছিল পুষ্প। জগনের কথায় বলে—বাসা! হেসে ফেলে পুষ্প—আর্সুলা আবার পাখী। ইখানে আবার বাসা, তাকি গাছের ডালেই বেঁধেছো? না মাটির তলে!

—চল না! দেখাই তোকে।

ব্যাকুল সেই আহ্বান। পুষ্প যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলে ওর সান্নিধ্যে এসে। ওর পিছুপিছু চলেছে মন্ত্র চালিতের মত।

আলো ঝলমল মেলা, কোলাহল কলরবের মধ্য দিয়ে রকমারী দোকান পশারের পাশ দিয়ে চলেছে তারা। হঠাৎ যেন দিল দরিয়া

হয়ে উঠেছে জগন। হাতে কাঁচা পয়সা আর পাশে পুষ্পকে পেয়ে তার অবস্থা এখন সমরখন্দের শাহের মতই। তমাম সমরখন্দ একটি তিলের বিনিময়ে সে বিকিয়ে দিতে চায়।

এ দোকান সে-দোকানের সামনে এসে দুজনে দাঁড়ায়। এটা সেটা কিনেই চলেছে। আজই যেন তারা ঘর বাঁধতে চলেছে পিছনের সব পরিচয় ফেলে।

জগনের এতদিনের সাধ আজ যেন পূর্ণ হতে চলেছে। এমনি একটি নারীর সান্নিধ্যই চেয়েছিলো সে সরা মন দিয়ে।

প্রতিবাদ করে পুষ্প—উহুঁ, চুড়ি পরবো কি গো। কাঁচের চুড়ি বোষ্টমের মেয়ের হাতে? আমার লজ্জা করছে কিন্তু।

বাধা মানে না জগন—এখন না পরিস পরে পরতে মানা নাই। নে এই আকাশী রংয়ের চুড়ি, তোকে মানাবে ভালো!

একরাশ চুড়ি, ফিতে, স্নো আরও কত টুকিটাকিতে বোঝাই হয়ে ওঠে পুষ্পের দু'হাত। হেসে বলে—ওমা এত কি হবে?

মেলার কলরব একটু থেমে এসেছে এখানে। আমগাছের ডালে ঝুলছে হ্যারিকেন কয়েকটা। জায়গাটুকুর পরই ওদের বাসা, থাকবার আস্তানা। তার ওদিকে মেলার বাইরে তালপাতার বেড়ার ঘর আর খড়ের ছাউনি। ঝুমরী মেয়েদের থাকবার জায়গা; অন্ধকারে ওখানে অনেকেই হানা দেয়। মেলার অন্যতম আকর্ষণ ওরা। দেহপসারিণীদের আস্তানা।

হটাৎ গানের সুর, ঢোলের শব্দ কাণে আসতে থমকে দাঁড়াল পুষ্প। শিউরে ওঠে—ব্যাপারটা অনুমান করে, কোন নরকের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে বুঝতে পারে। ঘৃণা বোধ করে নিজেই।

—এ কোথায় এলাম? পুষ্প বলে ওঠে। জগনের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। ওকে কেমন অন্য চোখে দেখে আজ।

জগন বলে—একটু পার হয়ে গেলেই ওদিকে আমার আস্তানা।

পুষ্প বলে ওঠে—এইখানেই বাসা নাকি। এই ঝুমরী তলায়?

জগন যেন চমকে ওঠে পুষ্পের কণ্ঠস্বরে। কুমুদের কণ্ঠেও ঠিক এমনি ঘৃণার সুর ফুটে উঠতো।

বাতাসে টক টক ধেনো মদের গন্ধ, যেন ভন ভন করে উড়ছে মাছি। কার জড়িত কণ্ঠের সুর ভেসে আসে, ছায়ামূর্তি কজন চলেছে ওই গানের আসরের দিকে।

হঠাৎ ওদের দুজনকে দেখে থমকে দাঁড়াল ওরা। ওদের মধ্যে একজন বলে ওঠে—কে বাবা ইখানে রাসলীলা জুড়েছো ?

সকলেই হেসে গড়িয়ে পড়ে এ ওর গায়ে।

পুষ্প রুখে দাঁড়াতে চায়, জগনই টেনে নিয়ে চলে গেল তাকে। ওদের সঙ্গে এখানে কথা কাটাকাটি নিরাপদ নয়।

গজরায় পুষ্প—তাই বলে চুপ করে থাকব ?

পুষ্প আজ রাতের অন্ধকারে ওই কদর্য্য রূপ দেখে শিউরে উঠেছে। সেও যেন ওই দেহপসারিনীদের মতই যেচে এসে জগনের কাছে ধরা দিয়েছে।

গুম হয়ে বসে আছে পুষ্প, অসহায় রাগে ফুলছে। এমনি জানোয়ারের পালের সামনে কখনও পড়েনি সে। আজ এদের উপর একটা বিজাতীয় ঘৃণা জন্মেছে। জগনের উপরেও। ওই আম বাগানে আবছা আলোয় যাদের দেখে এসেছে, তাদের থেকে ওর নিজের যেন কোন পার্থক্য নেই। একজন দেহ বেসাতির জন্য পসরা খুলে হাটে মাঠে ঘুরছে আর সেও যেন তাদের সামিল হয়ে উঠেছে।

জগন আজ খুশীর ধাক্কায় মদের বোতল ঘরেই খুলে বসেছে। বিশ্রী একটা টক গন্ধ বাগানের ওই মত্তপ জানোয়ারদের গায়ের গন্ধটার মতই এক ধাঁচের। পুষ্প কোন জবাব দেয় না। ওর মনের কোনে কোথায় যেন ঝড় উঠেছে। জ্বালা সারা মন জুড়ে। সরপাতা আর দরমার বেড়া ঘেড়া ঘরে হুহু ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। ওই ঠাণ্ডায় তবু তার জ্বালা কমেনি। জগন আজ ওদিকে বসে মদ খাচ্ছে

আর বলে চলেছে—আজ আর খেলায় বসবো না পুষ্প। চুলোয় যাক ওসব। মারুক আজ বাজীর দান গদা শালাই।

নিজেই আজ খুসীর আবেগে বলে চলেছে কথাগুলো। বেপরোয়া উদ্দাম হয়ে উঠেছে সে।

হঠাৎ পুষ্পের দিকে নজর পড়তেই কেমন চমকে ওঠে। তার মনে চোখে কোথাও সেই কামনার প্রতিফলন নেই। স্থির হয়ে কি ভাবছে পুষ্প। অবাক হয়ে বলে ওঠে জগন—এ্যাই, তোর হল কি?

ওর কথায় চমকে ওঠে পুষ্প। পুষ্পের মুখ চোখ থমথমে, তবুও বলবার চেষ্টা করে—কই না, কিছুই হয় নি তো।

জগনের মন মানে না! অনুরোধ করে—কথা কইছিস না যে, এক ঢোক চলবে? কতো বাবাজী বোষ্টম এখানে এসে কারণ করে যায়।

পুষ্প জবাব দেয় না। ওর দিকে চেয়ে থাকে। জগন অবাক হয়ে যায় ওর দিকে চেয়ে। এযেন সেই পুষ্প নয় যে তার সারা মনে এনেছে কামনার ঝড়, যে তার ব্যথা বিক্ষুব্ধ মনে এনেছিল শান্তির স্পর্শ, এনেছিল কোন নিরুদ্দেশে শুধু ভেসে যাবার দুরন্ত আবেগ।

এ অন্য কোন এক চিরন্তন নারী। যে পথ ছেড়ে একটি মানুষকে ভালবেসে ঘর বাঁধতে চায়, সুখী হতে চায় তার শান্তিভরা ছোট্ট ঘরের কোনে। একটি পুরুষকে ভালবেসে আপন করে তাকে বন্দী করতে চায়। যাযাবর হাসকে যেমন ঘরবাসী করে বনমরালী।

এ তেমনি কোন এক চিরন্তন নারী।

কুমুদের সঙ্গে এক জায়গায় তার ঘনিষ্ট মিল রয়েছে। পুষ্পের কথায় তাই ফুটে ওঠে।

—এমনি করে রোজই মদ খাও? মাতাল হতে লজ্জা করে না? জগন চমকে ওঠে ওর কথায় আর চাহনিতে। কেমন যেন কুমুদকেই মনে পড়ে।

হাসে জগন—তাতে দোষ কি?

জবাব দেয় না পুষ্প। মেলার কলরব কোলাহল ভেসে আসে। ভেসে আসে ওদের কুৎসিত গানের টুকরো। জগন বলে ওঠে—জুয়ার দানেই সব এড়ে দিয়েছি পুষ্প। নিজেকে যেদিন চিনিনি জানিনি সেইদিনই জুয়ার দানে এড়ে দিলাম সব। যেদিন চারিদিকে চাইলাম—দেখলাম আমি ফতুর হয়ে গেছি। এত সাফাই খেলোয়াড় হয়েও সে বাজীর দানকে ঘোরাতে পারলাম না।

পুষ্প চেয়ে থাকে তার দিকে। লোকটার জন্য মায়া হয়। কিন্তু কি সে করতে পারে? ওই নরক ও যেন অসহ্য হয়ে উঠছে তার কাছে।

এগিয়ে আসছে জগন। দুচোখে তার নেশার মাদকতা, পা দুটো টলছে। ঘরের খুঁটি ধরে দাঁড়াবার চেষ্টা করে।

—তুইও হিতোপদেশ দিস না পুষ্প। একদিন সেও দিয়েছিল, তাকে সইতে পারিনি। তুইতো এমন ছিলিনি মাইরী।

পুষ্প বাধা দেয়—চুপ করবে? না তোমার মাতলামী দেখতে হবে সারারাত।

পুষ্পের কণ্ঠস্বরে কি যেন কাঠিন্য ছিল, তাই হয়তো জগন পিছিয়ে গেল।

রাত কত জানে না, ঠিক ঠাওর করতে পারে না পুষ্প। গাছে গাছে ঠাঁই ঠাঁই আঁধার জমাট বেধে আছে; দু একটা পাখী ডাকতে সুরু করেছে। পূব দিকের মাথায় লাল আভা। পুষ্প কাউকে কিছু না জানিয়েই বের হয়ে পড়েছে পথে। জগনকে দেখেছে—মাতাল হয়ে একপাশে পড়ে আছে, সান নেই। মুখে গাঁজলা উঠছে মদের ঝোঁকে।

ঘৃণায় অপমানে আজ শিউরে উঠেছে পুষ্প। এ কোথায় এসেছিল সে। মনের মানুষের সন্ধান করতে গিয়ে নরকের ধারে পৌঁচেছে। মেলার রূপ দেখে চেনা যায় না, সারা রাত্রির কলরব কোলাহলের পর স্তব্ধ সুপ্তিমগ্ন এই রূপ। গাড়োয়ানরা গাড়ী ছেড়ে ঘুমুচ্ছে কম্বল মুড়ি দিয়ে। মাটির বুকে জমেছে শীতারম্ভের এক পুরু শিশির। কুকুরগুলো উঠোনের গাদায় ল্যাজে মাথায় এক হয়ে

পড়েছিল—পায়ের শব্দে মুখ তুলে চেয়ে আবার মাথা নামাল কুণ্ডলীর মধ্যে, কোথায় যাবে জানে না।' বাড়ীই ফির'ব। পায়ে পায়ে হঠাৎ সেই বাউলদের জমায়েতের দিকে এগিয়ে আসে কি যেন আশা নিয়ে। সেই মেয়েটির কথা মনে পড়ে বারবার।

সেই সন্ধ্যায় গাছতলায় এসে দাঁড়াল পুষ্প। কেউ কোথাও নেই। সেই অধরা মানুষগুলোও যেন কোথায় আবার হারিয়ে গেছে। একরাত্রির বাসা—আবার পথেই হারিয়ে যাওয়া, এই তাদের জীবন। পিছনে কোন বাকী বকেয়া থাকে না। উধাও হয়ে যায়। ঝাকড়া অশথ গাছের নীচে সুরটা যেন তখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কি রূপ দেখলাম রে,
আমার মাঝত বাহির হইয়া
দেখা দিলেক আমারে ॥

নিজের মনের সেই অতন্দ্র রূপের এক নজর চাহনিতে আজ অন্য এক বস্তুতে পরিণত হয়েছে পুষ্প; তাই সব পিছনে ফেলে আবার এগিয়ে চললো বাড়ীর পথ ধরে। পড়ে রইল জগনের কিনে দেওয়া রেশমী চুড়ি, ফিতে, পাউডার, স্নো আরও কত কি।

সকালের রোদ নদীর সবুজ ছোলা যবের ধারে মসবরন্দী পুরোণো অর্জুনবনে এনেছে সোনা রং-এর প্লাবন, পাখী ডাকা প্রান্তরে হঠাৎ ভেসে ওঠে একতারার রিণিঝিণি সুর। পাখীর ডাক, মাটির সোঁধা গন্ধ আর সবুজের রং যেন একাকার হয়ে মিশে গেছে ওই সুরে।

কি রূপ দেখলাম রে!

অপরূপ এক মহান সৌন্দর্য্যের স্বাদে পুষ্পের মন ভরে ওঠে। এগিয়ে আসে ওদের দিকে।

নদীর খেয়াঘাটের ধারে বসে আছে কালকের সন্ধ্যার সেই বাউলের দল। খেয়া পারের আশায় মেয়েটি গুন গুন করে গাইছে

গানের একটা কলি। চুপ করে তার পাশে এসে দাঁড়াল পুষ্প। কি ভেবে জিজ্ঞাসা করে —কোথায় যাবে তোমরা ?

পুষ্পের প্রশ্নে হাসে মেয়েটি, বলে—পথে!

—পথে! অবাক হয় পুষ্প। রূপবতীই ছিল এককালে, আজও সেই রূপের চিহ্ন মুছে যায়নি মেয়েটির! পুষ্প ওর দিকে চেয়ে থাকে। ঠিক যেন ওর কথাটা বুঝতে পারে না।

সবার পথের শেষ, হয় বাড়ী না হয় অন্য কোন ঠাঁইএ গিয়ে। কিন্তু এ পথের শেষ তো নেই। সে চলেছেই, অন্তহীন তার চলা।

মেয়েটি হাসে—বিশ্বাস হ'ল না বুঝি! এ পথের শেষ নাই। এ পথের দুধারে আলো ফোটে, মেঘ নামে। হাসি আর কান্নায় ঢাকা এপথ গিয়ে থেমেছে মুক্তির দেশে। সেই পথের সন্ধানেই যে বেরিয়েছি দিদি।

কথা কয় না পুষ্প। নদী পার হয়ে ওরা চলে গেল বাঁ হাতি বীরচন্দ্রপুরের পথের দিকে। সেইখানে ওদের আখড়াও আছে। দু'এক দিনের জিরেন নেয় সেখানে, তারপর আবার নামে পথে।

বেরা পার হয়ে, বাদশাহী শড়ক ধরে পুষ্প এগিয়ে চলে বাড়ীর দিকে। বারবার ওই বাউলদের দিকে ফিরে ফিরে চায়। কে যেন তাকে টানছে ওই যাত্রীদের সঙ্গী হতে।

একটা ভুল কোথায় ভেঙ্গেছে তার। জগনকে বাঁধতে গেলে তাকেও গিয়ে ওই নরকে নামতে হবে। শুধু দেহ—দেহ নিয়েই খুশী হতে চায় সে। নিজের মনের কোন সংবাদই সে রাখে না। অন্য কারো মন বলে কোন বস্তু আছে তা জানে না জগন। পুষ্পের মন তা মেনে নিতে পারবে না।

আজ সেই ভুল ভেঙ্গে হালকা মনেই বাড়ীর পথে ধরে। আনমনে গান ধরে গুণ গুণ করে।

'ও কি রূপ দেখলাম রে!'

পেয়েছে আজ এই নিজের কাছেই নিজের সত্বার কি যেন এক নোতুন পরিচয়। তাই গান জাগে তার কণ্ঠে; সুর জাগে তার মনে।

জাগে বিস্ময়। এযেন অন্য কোন পুষ্প; এতদিন মনে হয় এক মরিচিকার পিছনেই ফিরেছে। এক মানুষ থেকে অন্য মানুষে কিসের সন্ধান করে। হঠাৎ আবিষ্কার করে নিজেকেই খুঁজেছিল সে ওদের মাঝে নিজেকে নিঃশেষে হারিয়ে।

কুমুদের পথ চাওয়া ব্যর্থ হয়েছে। কয়েকটা মাস কেটে গেছে তবু জগন আসেনি একবারও। সেদিন হঠাৎ খবরটা পেয়ে প্রথমে বিশ্বাসই করেনি। ওপাড়ার নদেব চাঁদ মেলায় গিয়েছিল—সে এসে বেশ ঝগড়ার সুরেই গোবিন্দকে কথাগুলো শোনায়।

—জুয়ারী জামাই করেছো যা হোক। চক্ষের নিমিষে দশটাকা হাতে হাত উধাও। বলে কিনা দান পড়েনি তোমার। ভালা জামাই করেছো?

কুমুদ বাড়ীর ভিতরে কি করছিল, কথাটা কাণে যেতেই চমকে ওঠে। লজ্জায় মাথা নীচু হয়ে আসে। তাকে থামাবার চেষ্টা করছে গোবিন্দ—চুপ করো নন্তু। মানে মাঝে মাঝে খেলে ও।

চাপা দেবার চেষ্টা করে গোবিন্দ।

নদেব চাঁদ দশটাকা হারাণোর দুঃখ ভুলতে পারে না। তাই গর্জন করছে সে—এক আধটু খেলছে? ঈশ্বর জুয়াড়ীর ব্যাটা জগনা, চাকলার লোক তাকে চেনে। জুয়াড়ী মাতালের হাতে শেষকালে মেয়েটাকে দিলে, কেটে কুটে নদীর জলে ফেলে দিলেই পারতে! এতদিনে বুঝলাম কেন মেয়েকে এনে ঘরে রেখেছো। আরে বাবা সাধ করে কি কেউ ভিজে কম্বল ঘাড়ে চাপায়।

গোবিন্দ চঠে ওঠে—কি বলছো যা তা?

—যা তা বলিনি খুড়ো। মেয়েকে সরিয়ে এনে ভালোই করেছো। কুনদিন গুম খুন করে ফেলতো ঐ ডাকাত জুয়াড়ীটা।

আর কি যেন বলছিল নদের চাঁদ। গোবিন্দ মোড়ল তাকে যেন সরিয়ে নিয়ে গেছে এখান থেকে।

হাত পা কাঁপছে তার। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে কুমুদ। কি যেন স্বপ্ন দেখছে। বীভৎস কালো একটা ছায়া যেন ঘনিয়ে আসে তার চারিদিকে। ঘন অন্ধকার ঢেকে ফেলে সব কিছু। জগন তারই মাঝে যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। কুমুদের বুক ঠেলে আসে জমাট ব্যর্থ কান্না।

চুপ করেই ছিল। সব শুনেও লজ্জায় নিজে বের হতে পারে না কুমুদ। নদের চাঁদ দশটাকা হারিয়ে এসে গাঁ ময় কথাটা চাউর করে দেয়। চরম আঘাত হানে ওপাড়ার পটুর বৌ। সাজবেশ করে এসেছে কথাটা শোনাবার জন্যই।

কুমুদের মা অভ্যর্থনা জানায়—আয় বাছা। ক'দিন অসিসনি কেন?

—মেলায় গিয়েছিলাম পিসি।

পটুর বৌ আসর জাঁকিয়ে বসেছে মেলার গল্প করতে—সিনেমার গল্প। ছবিতে কেমন কথা বলে। হঠাৎ বলে ওঠে কণ্ঠস্বর নামিয়ে একটু সন্দিগ্ধ স্বরে—তোমার জামাইকে দেখলাম কাকীমা; তার সঙ্গে একটা কে মেয়ে ছিল। কি হাসি তাব। কত কি জিনিষ কিনে দিয়েছে—বেশমী চুড়ি, হিমানী, পমেটম আবো কত কি! ছুঁড়িটা কেলা কুমুদ? বেহায়ার শেষ। হেসে যেন গড়িয়ে পড়ছে জামাই-এর গায়ে। ঝুমরী ছুঁড়ির মত ধরণ ধারণ।

কুমুদ ঘর থেকে বের হয়ে এসেছিল, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ওর কথা শুনে। মুখ চোখ ফ্যাকাসে। মুহূর্ত মধ্যে হাসি হল্লাব আসরে কি একটা স্তব্ধতা নেমে আসে। কুমুদ উঠে পড়ল। পটুর বউ কৃত্রিম দরদ ভরা কণ্ঠে বলে ওঠে—কি হল তোর?

—কিছু না! কুমুদ সরে এল ভিতবে। ঝরঝরিয়ে জল নামে দুচোখে।

এখুনিই যেন পড়ে যাবে ও। চোখের সামনে কেমন অন্ধকার, সাদা কালো ফুটকি ভেসে ওঠে। পায়ের নীচে মাটি কাঁপছে থর্ থর্ করে।

মাও পিছু পিছু এসে হাজির হয়েছে। কুমুদ ইতিমধ্যে স্থির করে ফেলেছে। যতই কঠিন হোক না কেন সে করবেই। একবার মস্ত ভুল করে এসেছে সে। আর সেই ভুল সে করবে না। মনে মনে শক্ত হয়ে উঠেছে এই চরম আঘাতে। কুমুদ চুপ করে থেকে বলে ওঠে—ক'দিনের জন্য পাঁচগাঁয়ে যাবো মা ?

মা মেয়ের দিকে চেয়ে থাকে। এ যেন অন্য কোন কুমুদ। নিদারুন ঝড়ে কঠিন আঘাতে বদলে গেছে সে। মাও আজ মেয়ের জন্য দুঃখ অনুভব করে। মেয়ের কথা শুনে মা কিছু বলতে পারে না। বড় সাধ ছিল এই খানে কয়েক মাস থাকবে, কিন্তু এ সময় না বলতেও পারে না। ওর কথায় সায় দেয়।

—তা যাবি, বেশ তো।

মা চলে যেতে হঠাৎ কুমুদ যেন কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। ঠিক বুঝতে পারে না তার কোথায় যেন কি একটা গুরুতব ক্ষতি হয়ে গেছে। জগনকে আজ এতটুকুও বিশ্বাস কবতে পারে না সে।

জগন সকালে উঠেই দেখে বাসা শূন্য, ঘরের মেজেতে কালকের কেনা জিনিষপত্র সব ছত্রাকার করে পড়ে আছে। পুষ্প নেই। ওদিকে খড়ের উপর ছেঁড়া লেপ গায়ে বুড়ো ভালুকের মত আঁতুড়ি ভুতুড়ি হয়ে পড়ে আছে গদাই কামার।

কাল রাতের কথাগুলো আবছা মনে পড়ে, কি যেন একটা মধুর স্মৃতি। ঠিক মনে পড়ে না। কেমন ফেঁসে যায় চিন্তাধারার প্রবাহ। যোড় লাগে না। পুষ্পের মুখখানা মনে পড়ে। মদের ঝোঁক তখনও কাটে নি। মাথা ঝিমঝিম করে তীব্র বেদনায়, যেন ছিঁড়ে পড়েছে। রাগ আর উত্তেজনায় কাঁপছে সে।

উঠে বসলো জগন। অপেক্ষা করে পুষ্পের জন্য।

কিন্তু সকালেও ফেরে না পুষ্প। কে জানে কোথায় গেছে। কি যেন দুর্বার প্রতীক্ষা নিয়ে কাটে তার সারাটা দিন।

তবু এল না পুষ্প। এতক্ষণে মনে হয় কি যেন একটা ঘটে গেছে।

পুষ্প চলে গেছে তাকে ফেলে। কোথায় যেন একটা কিছু ঘটেছে। চঞ্চল হয়ে উঠে পড়ে সে।

কি ভেবে নিজেই বের হয়ে পড়ে। গদা ওর দিকে চেয়ে থাকে।

—কোথায় যাচ্ছ ওস্তাদ ?

কথার জবাব দিল না জগন। মনে তার ঝড় বয়ে চলেছে। পুষ্পের কামনা-ব্যাকুল চোখ দুটো তাকে আনমনা করে দেয়।

—কিগো ? গদাই প্রশ্ন করে, জগনের চমক ভাঙ্গে। যাবার মুখে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে।

—বাড়ী থেকে ঘুরে আসবো আজ রাতেই।

মনে মনে কি ভাবছে গদাই। ওর কথায় গদা প্রতিবাদ করে না। ওস্তাদ না থাকলে আসর একাই মাৎ করে সে। পাওনার দশ আনা হিস্যা। তাই চুপ করেই থাকে।

বের হয়ে পড়ে জগন। মাথার মধ্যে আগুন জলছে; কি যেন পাওয়ার নেশায় আজ মেতে উঠেছে সে। পুষ্পকে পেতেচায় সে, দরকার হয় গ্রাম ছেড়ে আজই পাড়ি জমাবে অন্যত্র। একটু পাওয়ার স্বাদ আজ তাকে উন্মাদ করে তুলেছে কি এক নেশার ঘোরে। নিঃশেষে তাকে পেতে চায় সে।

কতখানি পথ জানে না, কি ভাবে এগিয়ে এসেছে সে দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। কোন দিকে চাইবার অবকাশ তার নেই। গ্রামের মুখে হরিসাগরের পাড়ে যখন সে এসে উঠলো তখন সন্ধ্যা নেমেছে আকাশে। বাবুদের ঠাকুর বাড়ীতে আরতির বাজনা বাজছে; আঁধারে জ্বলে উঠেছে দু'একটা সন্ধ্যা প্রদীপ। আবছা আঁধার ঢাকা পথে এগিয়ে চলে জগন।

সারাটা দিন মদ খেয়েছে সে। পা দুটো টলছে। সারা শরীরে উষ্ণ রক্ত স্রোত, মাথায় কেমন আগুণের মত জ্বালা। সারাদিন পুষ্পের জন্য পথ চেয়ে ছিল কিন্তু সে আসেনি।

এগিয়ে এসে জগন ডুবির আখড়ার সামনে দাঁড়াল। কেমন যেন চমকে ওঠে সে। জনহীন পরিত্যক্ত আখড়া। একটা কুকুর শুয়েছিল দাওয়ায়, ওকে দেখে উঠে এসে ল্যাজ নাড়তে থাকে। কেউ কোথাও নেই। নীরব অন্ধকারে ঢাকা ঠাঁইটায় শুধু জেগে আছে বকুল ফুলের উদগ্র সৌরভ। একটা পাখী একবার ডেকেই থেমে গেল, ওর পায়ের বেতালা শব্দে যেন ভয় পেয়েছে সে।

এদিকে ওদিকে চাইতে থাকে জগন। কি ভেবে দাওয়ায় এসে উঠে দেখে দরজায় তালা ঝুলছে। চালের বাতায় টাঙানো আশনাটা শূন্য। বিকৃত কণ্ঠে জগন ডাক দেয়।

—এ্যাই! পুষ্প!

কিন্তু ব্যর্থ সেই আহ্বান। কেউ কোথাও নেই। দমকা বাতাস এসে আছড়ে পড়ে আধার জমা ঝিঁ ঝিঁ জ্বলা বকুল গাছের মাথায়।

চুপ করে দাঁড়াল জগন। সব ব্যাপারটা কেমন যেন পরিষ্কার হয়ে ওঠে। কোথায় কি একটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে তার সব আশা কল্পনার সার্থকতার পথে। ডুবিই কারো সাহায্য নিয়ে এসব করেছে। পালিয়ে গেছে আবার মেয়েকে নিয়ে।

রাগে কাঁপতে থাকে জগন। পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত থর থর কাঁপছে। তাকে ফাঁকি দিয়ে পালাবে ডুবি, এ যেন অসহ্য হয়ে ওঠে। একবার খোঁজ খবর নিয়ে তারপর যা হয় ব্যবস্থা করবে। জগনকে চেনেনি ডুবি। মাসীর কথা মনে পড়ে, সেও বাধা দিয়েছিল তাকে।

পায়ে পায়ে বাড়ীর পথ ধরে অন্ধকারেই। আজ সব কিছু ওলট পালট করে দেবে জগন।

হঠাৎ বাড়ী ঢুকে প্রদীপের আলোয় কাকে দেখে থমকে দাঁড়ল জগন। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন আগাগোড়া সাজানো। নইলে একসঙ্গে এই সব ঘটবে কেন?

কুমুদ এসে পড়েছে। ওকে এখানে এসময় দেখবে কল্পনাও করেনি।

কুমুদও ভাবেনি আজই আসবে জগন। এক নজরে দেখে তাই চমকে ওঠে।

ওর চোখ মুখের ভাব বদলে গেছে। পা ছুটো টলছে, দুচোখ করমচার মত টকটকে লালবর্ণ। জড়িত কণ্ঠে বলে ওঠে—তুই! তুইও তাক্‌মত এসে জুটেছিস দেখছি। সে কই মাসী ?

কুমুদ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ওর দিকে। আজ তুলসীতলায় পিদীম জ্বালা ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থ হয়েছে, তার দেবতাকে প্রণাম করা। মাতাল মত্তপ লোকটা এগিয়ে আসছে তার দিকে।

কুমুদ ওর দিকে মুখোমুখি চেয়ে আছে। যা শুনেছে মনে হয় তা সবই সত্যি। জগন ক'মাসেই একটি জানোয়ারে পরিণত হয়েছে। বলে ওঠে কুমুদ—কবে থেকে এত উন্নতি হয়েছে ?

মাথায় রক্ত উঠে গেছে জগনের। ওরা সবাই চক্রান্ত করেই ভুবিকে পাঠিয়ে দিয়েছে, পুষ্পাকেও সরিয়েছে ওরাই। সরিয়ে দিয়েছে গ্রাম থেকে তার হাতের বাইরে। দপ্ করে জ্বলে ওঠে জগন।

—এখানে কি করতে এসেছিস ? খুব যে ট্যাক করে চলে গিইছিলি, বাপের বাড়ীর মুরোদ নাই বিটীকে পুষবার ?

পা ছুটো টলছে তার, গায়ে বিশ্রী টক টক গন্ধ। ক'মাসেই মানুষটা জানোয়ারের সামিল হয়ে উঠেছে। কুমুদ বলে ওঠে—তোমার গুণের কথা শুনে তোমাকে দেখতে এলাম। মেলায় কাকে নিয়ে গিয়েছিলে ?

—এ্যাও !

দপ করে জ্বলে ওঠে বারুদের স্তূপ। নিমিষের মধ্যে লাফ দিয়ে নেকড়ে বাঘের ছাগলের টুঁটি ধরার মত শক্ত হাত দিয়ে কুমুদের কণ্ঠ রোধ করে দেয়। হাত থেকে পড়ে যায় লণ্ঠনটা। কুমুদের আর্ত চীৎকারে এসে হাজির হয় মাসী।

—ওরে হতভাগা, কি করছিস !

কুমুদ অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল।

মাসীর হাতের কাছে পড়েছিল একটা মুড়ো ঝাঁটা। তাই দিয়েই

পিটতে থাকে জগনকে। চীৎকার করতে থাকে—বাপ্‌কো বেটা। তোর বাপও বৌটাকে এমনি করে টুঁটি টিপে মেরেছিল, তুইও তাই করবি নাকি? মাতাল জুয়াড়ীর বংশ। লম্পট কোথাকার। লজ্জা নাই। মরিস না তোরা। মর, মর তুই। মাসীর চীৎকার রাতের অন্ধকার ফাটিয়ে তোলে। কুমুদের কান্না ডুবে গেছে তাতে।

মর!

মৃত্যুর সন্ধান পায় জগন বাতাসে। নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে, নোনা আস্বাদ নাকে, জিবে। পুষ্পের মুখখানা মনে পড়ে। কঠিন বাধার মত দাঁড়িয়েছে মাসী তাকে পাবার পথে,তাই কুমুদকে এনেছে পুষ্পকে আজ তাড়িয়ে দিয়ে। সব যেন তালগোল পাকিয়ে যায়।

অতর্কিত আক্রমণে জগনও মরীয়া হয়ে ওঠে। কুমুদকে ছেড়ে দিয়ে মাসীকে এক লাথির ঘায়ে উঁচু দাওয়া থেকে ছিটকে ফেলে দিয়ে ওর ওপর লাফ দিয়ে পড়ে জগন।

শিউরে ওঠে কুমুদ। লোকটা আজ জানোয়ারের মত ক্ষেপে গেছে রক্তের স্বাদ পেয়ে। শক্ত শানের উপর বুড়ীর অর্দ্ধ অচেতন মাথাটা ঠুকছে প্রচণ্ড জোরে। আবছা আলোয় সেই নৃশংস দৃশ্য দেখে ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে কুমুদ, ভাষা হীন অব্যক্ত ভয় চকিত একটা চীৎকার ওঠে অন্ধকার আকাশ ফাটিয়ে। জগনের কোন জ্ঞান নেই—প্রাণপণ শক্তিতে ওর কণ্ঠনালী পিষে ফেলেছে। কয়েকবার নড়ে উঠেই স্থির নিথর হয়ে আসে বুড়ীর প্রাণহীন দেহটা।

কারা যেন ছুটে আসে। জগনের দু'হাতে উষ্ণ রক্তের ছোঁয়া। জামা কাপড়ে লেগেছে তাজা রক্ত, সান বাঁধানো ঠাঁইটা ভেসে গেছে জমাট রক্তে।

কুমুদ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে জমাট স্তব্ধ আতঙ্কে। চোখের সামনে নেমে আসে অতল অন্ধকার।

লোকজনের কোলাহলে কেমন যেন আবছা জ্ঞান ফেরে কুমুদের। পুলিশ এসে গেছে, এসে গেছে ডাক্তারও। বাড়ীর উঠোন

ভরে গেছে লোকে। মাসীকে খুন করেছে জগন।

লোকজনের ভিড়ে ভরে গেছে উঠোন। থানা থেকে দারোগাবাবু এসেছেন, ওকে কি যেন জিজ্ঞাসা করছেন তিনি। দূরে চাদরে ঢাকা মাসীর দেহটা পড়ে আছে।

ভয়ে কথা বলবার ক্ষমতাটুকুও নেই কুমুদের। আবছা অন্ধকারে দেখেছিল জগনের চোখে হিংসার ধক্‌ধকে আগুণ। তাকেই খুন করে ফেলতো। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে ওঠে কুমুদ। ডাক্তারবাবু বাধা দেন—এখন এজাহার করা ঠিক নয় দারোগাবাবু, একটু সুস্থ হলে ওকে জিজ্ঞাসা করবেন। কুমুদ ফুপিয়ে কেঁদে ওঠে।

ওদিকে মাথা নীচু বসে আছে জগন! দুজন কনষ্টবল জগনকে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে গেল।

হুকুম দেন দারোগাবাবু—সেই সঙ্গে লাশটাও, সদরে মর্গে পাঠাতে হবে।

ওদের সব কথাগুলো শুনতে পায় না কুমুদ।

হৃদয় মুখুয্যের বৌ মালতী এসে জুটেছে। এতক্ষণ সেই ওর পাশে ছিল। জল ঢেলে হাওয়া করে জ্ঞান ফিরিয়েছে। ওর হাত দুটো ধরে কি যেন নির্ভর খোঁজে কুমুদ।

এতবড় বাড়ীতে একা থাকতে ভয় পায় কুমুদ। চোখের সামনে জেগে ওঠে আঁধার ফুঁড়ে কালো জলন্ত দুটো চোখ যেন তার দিকেই এগিয়ে আসছে। সেই-ই তার পথের কাঁটা, তাকে সাফ করবার জন্য জগন অতন্দ্র প্রহরীর মত যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। মালতী ওকে সুস্থ হতে দেখে উঠে দাঁড়ায়। নানা কাজ ফেলে এসেছে সে। তাই বলে ওঠে আমি এবার যাই কুমুদ।

মালতীর কথায় আর্তনাদ করে ওঠে কুমুদ—এখানে, এই ভূতের রাজ্যে আমাকে ফেলে যাস না মালতী। ওরা আমাকে বাঁচতে দেবে না। এখানে থাকলে ও নিশ্চয়ই আমায় মেরে ফেলবে, আমাকে নিয়ে চল তুই!

মালতী সান্ত্বনা দেয়—ভয় কিসের ? বেশতো, আমার ওখানেই চল।

ফিস্‌ফিসিয়ে বলে কুমুদ—জানিস না মালতী, আমার চেয়ে ওর বেশী হিংসা পেটে যে আসছে তার উপর। তাকেই মারতে এসেছিল ও।

কুমুদ অজানা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। মালতীই নিয়ে গেল তাকে। এ বাড়ীর উপর কিছুমাত্র মায়া তার নেই, মায়া নেই ওই দুর্মদ জানোয়ারটার উপর। কেমন যেন সব আশা তার ব্যর্থ হয়ে গেল। নিভে গেল সব আলো।

জগনকে এতদিন চিনতে পারেনি কুমুদ। সত্যই ও একটা পশু। বাপের মতই দুর্মদ পশু—যে নিজের স্ত্রীকে হত্যা করতেও দ্বিধা বোধ করেনি।

কুমুদ জগনকে সইতে পারে না, ও চলে যাক দূরে। কুমুদও চলে যাবে এ বাড়ী ছেড়ে। অভিশপ্ত এই মৃত্তিকা, এর বাতাসে মিশে আছে কার হতাশ কান্না; ঈশ্বরদাস আর জগনের খুনের ইতিহাস, কোন অতৃপ্ত অশরিরী আত্মার ব্যর্থ ক্রন্দন আর বুকভরা অভিশাপে এর আকাশ বাতাস বিষিয়ে রয়েছে।

খবর পেয়ে গোবিন্দ মোড়ল এসে হাজির হয়েছে। কুমুদকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা তার নেই। শূন্য পুরীতে একাই রয়েছে কুমুদ। বাবাকে দেখে আজ ব্যর্থ কান্না আর হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে। আশা কামনা তার শূন্যে মিলিয়ে গেছে কোন অতীত রাত্রে দেখা স্বপ্নের মত। তবু পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মাঝে একটু আলো, একটি সুর শুধু জেগে আছে, সে আগামী সন্তানের আবির্ভাব।

জগনকে ওরা সদরে চালান দিয়েছে। সব ইতিহাস আপাততঃ চাপা পড়ে গেছে। গোবিন্দ ওকে নিয়ে যেতে এসেছে। এ অবস্থায় একা কুমুদকে এই প্রেতপুরীতে ফেলে যেতে মনে চায় না। কুমুদও ভাবছে, এছাড়া আর পথও সে খুঁজে পায় না।

মালতী চুপ করে থাকে, সে মত দেয় গোবিন্দের কথায়।

—সেই ভাল। এ বাড়ীতে একা কি করে থাকবি কুমুদ। কোলে যে আসছে তাকে নিয়ে ফিরে আয়। তখন তবু থাকতে পারবি তাকে নিয়ে।

ওই একটি স্বপ্নই আজ কুমুদের মনে শেষ আশার মত টিকে আছে। তার ঘর বাঁধার সব স্বপ্ন বুদ্‌বুদের মত মিলিয়ে গেছে কোন অসীমে।

বাবার কথাগুলো শুনলো কুমুদ চুপ করে। চলেই যাবে এখান থেকে আপাততঃ। যাবার আয়োজনও করছে। সব খেলা যেন তার সাঙ্গ হয়ে গেল।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে কাকে আসতে দেখে মুখ তুলে চাইল কুমুদ। পুষ্প এসেছে। যার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছিল, যাকে ভেবেছিল পরম শত্রু বলে, সেই রূপবতী পুষ্প এসেছে।

—একি!

পুষ্পের দিকে চেয়ে থাকে কুমুদ অবাক হয়ে। ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারে না ওর জীবনের এই পরম সত্যটাকে।

নিজেকে বাঁচাবার পথ বের করেছে পুষ্প। মায়ের হাত থেকে বেঁচেছে। বারবার তাকে বৈষ্ণবদের বিভিন্ন আখড়ায় নিয়ে গিয়ে সেবাদাসীর নাম করে বিক্রির ব্যবসা বন্ধ করবে সে। নিজেকে তাই ধ্বংস করেছে একেবারে।

—এ কি করেছিস পুষ্প?

পুষ্প কাঁদছে। মাথার একরাশ কালো চুল কেটে ফেলেছে। চোখে কাজল, কপালে কুমকুমের টিপও নেই। মলিন বিবর্ণ, কুৎসিত হয়ে গেছে পুষ্প কদিনেই।

কান্নাভেজা কণ্ঠে পুষ্প বলে ওঠে—রূপ—রূপের আগুনে নিজে পুড়ে মলাম, জ্বালালাম আরও কত লোকের ঘর, সংসার। বুঝলি বৌ, ভাবছি এ রূপের আগুনে নিজে এইবার পুড়ে পুড়ে আংরা হবো।

কুমুদ ঠিক ওর কথা বুঝতে পারে না। চেয়ে থাকে ওর দিকে।

পুষ্প বলে ওঠে—তুইও কেন তাকে ছেড়ে গেছলি বৌ, পুরুষ মানুষকে জানোয়ারের মাঝে ছেড়ে গেলে সেও জানোয়ার হয়ে যায়। ফিরে এলে তাকে বুকে টেনে নিস বৌ। দেখবি, তোর পরশমণির ছোঁয়ায় সে আবার সোনা হয়ে উঠবে।

রহস্যময়ী পুষ্প। আজ সারা মনে কোথায় তার তৃপ্তির শান্তির সন্ধান।

পথে দেখা সেই বাউলদের কথা মনে পড়ে। মেয়েটির হাসির সহজ সাবলীল ধারা এখনও তার মনের আঁধার আলো করে তোলে।

—পথেই বের হবো সখি, আমার পথের শেষ নেই।

পুষ্প চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল। রাত হয়ে গেছে অনেক।

কুমুদ ওর দিকে চেয়ে থাকে। পুষ্প যেন নিজের পথ পেয়েছে, শান্তি পেতে হবে কুমুদকে—যদি কোনদিন ফিরে আসে জগন আবার একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে কুমুদ।

পুষ্প চলে গেছে অনেকক্ষণ। কুমুদ যাবার আয়োজন করছে। কালই চলে যাবে তারা। ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারে না কুমুদ। একজন রূপের মোহে পাগল হয়ে খুন করতে উন্মত্ত হয়েছিল, অন্যজন সেই রূপকে পুড়িয়ে নিখাদ সোনা করবার সাধনা করে। আলো আর আঁধার ঘেরা জগৎ। রাত্রির তপস্যা শেষ হয় আলোর জাগরণে। তার দুঃখের তমসাও শেষ হবে একদিন। জানে না কবে আসবে সেই শুভ তিথি।

পুলিশ যথারীতি কোর্টে কেস দিয়েছে জগনের নামে—খুনের চার্জ। বিচারও হয়ে গেছে ছ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। মাত্র কয়েকটি কথা। জজের হুকুম। একটি জীবনকে তিলে-তিলে নিঃশেষ করে দিতে ওইটুকুই যথেষ্ট।

কুমুদ শোনে স্তব্ধ হয়ে, কথা বলে না। শুধু দু'ফোঁটা জল ঝরে।

আজ জগনের জন্য মায়া হয়। একবার দেখে গেল না নিজের সন্তানকে। সন্তানও দেখবে না তার বাপকে ; জন্মের প্রথম ক্ষণে সে আনল বাবার বন্দী দশা।

জগন কাঠগোড়া থেকে ওর দিকে চেয়ে থাকে, চাইতে পারে না মাথা তুলে। কি যেন দুস্তর লজ্জা তার দু'চোখে। কুমুদের সারা মন হাহাকার করে ওঠে। সবকিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে চলে গেল সে।

মা সান্তনা দেয়—কেঁদে কি হবে বাছা ? সবই তাঁর ইচ্ছে।

তিনিটা যে কে, ঠিক ঠাওর করতে পারে না কুমুদ। যেই হোক সে, শুধু দুঃখই দিতে জানে সে। তাই দুঃখের সময়ই মানুষ তার অস্তিত্বের সন্ধান করে, তাকে ডেকে সান্ত্বনা পেতে চেষ্টা করে।

ছ'বছর! কতদিন! ছ'টা- বর্ষ আসবে যাবে—ছ'বার ওই সোণা-ফসলের ক্ষেতে আসবে সোণা ধানের যৌবন স্পর্শ, পূর্ণতার সংবাদ। সে কতো দিন—কত দূরের পথ! ঠিক ভাবতে পারে না কুমুদ, দেখতেও পারে না। দু'চোখ জলে ঝাপসা হয়ে আসে।

ছেলেটা কাঁদছে! আবার এই জগতের কঠিন অস্তিত্বে ফিরে আসে কুমুদ।

একদিন গিয়েছিল কুমুদ জগনের সঙ্গে দেখা করতে। অসুস্থ শরীর কুমুদের। বিরাট জেলখানায় তার ঘেরা একটা ঘরের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে জগন। দুজনের মধ্যে কঠিন তারের বেড়া।

মাথায় একটা টুপি, পরণে ডোরাকাটা পায়জামা একটা হাফ-কোটের মত। চেনা যায় না আর মানুষটাকে। সেই বাড়ন্ত গড়ন, নধর চেহারা হাসিহাসি ভাব নিঃশেষে মুছে গেছে ওর মুখ থেকে। নিবিড় কালো চিন্তার ছায়া, অজানা ব্যথা ওর সারা মুখে প্রকট হয়ে উঠেছে।

একবার মুখ তুলে চাইল মাত্র কুমুদের দিকে। কুমুদের সারা দেহে পূর্ণতার চিহ্ন ; দু'চোখে ওর কান্নার থমথমে ছায়া।

তার ব্যাকুল নারীমন আজ স্বামীর বেদনায় ব্যথাতুর হয়ে ওঠে। সব কলঙ্ক অপবাদের জন্য সে নিজেও দায়ী আজ। জেনে শুনেই সব মাথায় তুলে নিয়ে আজ জগনকে স্বীকার করে নেবে সে। আবার ঘর বাঁধবে।

সেই রাত্রের দেখা রক্তোন্মাদ মানুষ এ নয়। সম্পূর্ণ বদলে গেছে লোকটা, ঝড়ে উপড়ে পড়া বনস্পতির মত হতাশা আর বেদনায় মুষড়ে পড়েছে।

জগন কথা বলতে পারে না, মনে হয় কুমুদ আজও ঘৃণা করে তাকে। মেলার সার্কাসে খাঁচায় বন্দী বাঘ দেখতে যেমন লোক ভিড় করে, এখানেও যেন তেমনিই কিছু একটা মজা দেখতে এসেছে। কোন কথাই যেন আসে না তার কণ্ঠে।

কি করে বোঝাবে জগনকে, কত আশা ব্যাকুলতা নিয়ে সে চেয়ে আছে তার মুক্তির দিন। এখানে প্রায়শ্চিত্ত তার হয়নি। বাইরে গিয়ে আবার সব বদলে নোতুন করে বাঁধবে সে। সেদিন কুমুদকে তার পাশে চায়।

—সময় হয়ে গেছে ? কনষ্টেবল অদূরে বসে ছিল, সেই-ই হুসিয়ার করে দেয়। অবাধ মেলামেশার অধিকার আর ওর নেই। ওকে ওপাশ থেকে টেনে নিয়ে চলে গেল।

এদিকে পড়ে রইল কুমুদ। আজ কান্না আসে। মনে পড়ে নদীর ধারে একদিন কোন শিকারীর বন্দুকের গুলিতে চখা শিকারের ঘটনা। একটা রক্তাক্ত দেহে আছড়ে পড়ল নীল আকাশের বুক থেকে, অন্যটা চীৎকার করে ভরে তোলে চারিদিক। পিছু পিছু চলেছে শিকারির, সেই কাতর কান্নায় নদীতীর মুখর করে।

জগনকে ওরা নিয়ে চলে গেল দৃষ্টি সীমার বাইরে। একাই ফিরে এসেছে কুমুদ। চোখের জলে পথ হারিয়ে যায়, মনে হয় এ জীবনের কোন অর্থই নেই। পরম এক অভিশাপগ্রস্থ ছুটি সত্ত্বা তারা। অর্থহীন আঁধারে পথ খুঁজে চলেছে।

জগনও ভুলতে চেষ্টা করে সব কিছু। ছ'বৎসর আর বাইরে যেতে পারবে না সে। গ্রীষ্মের খর রোদ কাঁপা নদী তীর, বর্ষার গেরুয়া যৌবন বন্যা, আকাশ কালো করে নেমে আসা মিশি কালো মেঘস্তর আর তার চোখে ভেসে উঠবে না। কাণে আসবে না বর্ষামুখর শ্রাবণ রাত্রে মেঘ ভাঙ্গা চাঁদের আলোয় বৃষ্টি বিধৌত ধোঁয়া-মোছা রাত্রির মধুর একটি রূপ। ওই রাত্রের স্বপ্নের সঙ্গে মিশিয়ে আছে কুমুদেব কত স্মৃতি। কত তার সুখ স্বপ্ন।

তারপরই দিন বদলাবার পালা। শিউলী শাপলা ফোটে, ফোটে যতদুব চোখ যায় সাদা কাশের হাওয়া কাঁপা উত্তরী। শরতের পর থেকেই বসে তার আসব। হাতগুলো নিশপিশ করে। নিদেন তিনখানা তাসও যদি পেত জেলখানায়, বিড়ি না হয় দেশলাই কাঠির বাক্সি ধরেই খেলা চালাতো।

দিন আসে একটার পর একটা। আসে নিস্তব্ধ স্বপ্নভবা তারাজ্বলা রাত্রি। কত চিন্তা মনে আসে। পরক্ষণেই সব মন থেকে ঝেড়ে ফেলে সে। ভুলতে চায় সব কিছু।

শীতের বাতাস লাগে জেলখানাব গাছে গাছে। পুবোণো বট অশথ আমগাছ গুলোতে; বেড়া ঘেরা ক্ষেতগুলোতে কপির চারা মাথা তোলে। জেলখানাব পাঁচীল টপকে বাতাসে সওয়াব হয়ে এসেছে শীতকাল। কে জানে দিকে দিকে মেলার মরসুম পড়েছে। আলো আর কলরব, হাজার জনতার সামনে ছোট পাঞ্চ লাইটের আলোয় বসে থাকতো জগন। দু'চোখে তার সন্ধানী দৃষ্টি। টাকা-পয়সা সিকি আধুলির স্রোত বইছে।

শীতের হাওয়া কেমন কাঁপুনির আমেজ আনে।

—ক্যা হোতা হ্যায়?

পাহারাওয়ালার ডাকে ঘুম ভাঙ্গে জগনের। ঘুমের ঘোরে কি যেন বিড়বিড় করে স্বপ্ন দেখছিল। কি একটা মিষ্টি স্বপ্ন। তার দিনগুলো যে এত মাধুর্য্য আর বৈচিত্রে পূর্ণ ছিল এতদিন সে খেয়াল করেনি।

আজ চমকে ওঠে সেই জীবন হারিয়ে। কুমুদ আর পুষ্পের কথা মনে পড়ে। কাঁটার মত খচ-খচ করে বেঁধে একটা বেদনা সারা মনে।

পুষ্পকে ভুলতে চায় সে। দূর আকাশের কোন তারার মতই অধরা সে। তার ঘরে আজ কুমুদের প্রয়োজন, যার সন্ধ্যাদীপের আলোয় অন্ধকার আঙ্গিনা স্নিগ্ধ জ্যোতিতে ভরে দেবে দিনান্তের পর।

কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে এক ফালি ঘুলঘুলির বাইরে একচিলতে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে; আবছা চকচকে হয়ে উঠেছে নিরন্ধ্র আকাশ, পাখীর ডাকে ভেসে আসে ওইটুকু রন্ধ্র পথ দিয়ে।

কতদিন কাটাতে হবে ওই আকাশের পানে চেয়ে। বট অশত্থগাছে এসেছে কচি লালচে পাতার স্বপ্ন, বাতাসে জাগে উত্তরোল বকুল গন্ধ। জেলখানার ক্ষেতের ধারে ওই কালো নধর গাছটার দিকে চেয়ে থাকে জগন। মন কেমন করে তার।

কাজ করতে বের হয় জেলের মাঠে। অনেকখানি জায়গা জুড়ে ক্ষেত, মাঝে মাঝে আলিবাধ দিয়ে আলাদা করা, দু একটা তাল খেজুর গাছ উঠেছে—মাথা তুলে আছে বট অশত্থ গাছ।

কেমন যেন ওরই ফাঁকে ফাঁকে দূরে কোন ছায়াছন্ন গ্রাম দেখা যায়। বাতাসে আখবনের শন্‌শনানি। শীতের মিঠে রোদ সারামন ভরে দেয়। কোথায় কোন দিগন্তে উধাও হয় জগনের মন। কুমুদ আর ছেলের কথা মনে পড়ে।

—এ্যাই! ওকে কাজ বন্ধ করে কোন আসমানের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে মেট গর্জন করে ওঠে। ওর হাক ডাকে আবার কোদাল কোপাতে থাকে জগন। হাঁপিয়ে ওঠে পরিশ্রমে।

বেশ কটা মাসই কেটে গেছে এখানে। আকাশ কোলে তাম্রাভ রোদের খর দীপ্তি। বৈশাখ আসছে—আসছে নোতুন একটা বছর। এমনি কটা বছর কাটবে তার এইখানে, জগন তারই চিন্তা করে, দিন গোনে সেই মধুর স্বপ্ন বুকে নিয়ে।

কোন স্থানই শূন্য থাকে না। প্রকৃতির বুকে কোথাও ক্ষণিক হাওয়ার শূণ্যতা থাকলে যেমন চারিদিক থেকে বায়ুস্তর ছুটে আসে সেই শূণ্যস্থান পূর্ণ করে দিতে, সর্ব ক্ষেত্রেই সেই নিয়ম প্রযোয্য।

তাই জগন চলে যাবার পর প্রথম যাঁরা মুষড়ে পড়েছিল নিবিড় বেদনা আর হতাশায়, তারাও সামলে নিয়েছে, নেবার চেষ্টা করেছে! কোথাও হয় তো গভীর ক্ষত যদিও বা রয়ে গেছে তা গোপনেই রয়েছে।

প্রথম প্রথম অসুবিধায় পড়েছিল ওর সাগরেদের দল। মুষড়েও পড়েছিল, ক্রমশঃ সয়ে গিয়েছে।

গদাই কামার, নিবারণ আর গুপী তিনজনেই এবার দল চালাচ্ছে। গদাই-এর অবশ্য মাঝে মাঝে গচ্চা যায় খেলতে বসে। কোন রকমে গা বাঁচিয়ে নেয়, তবু হাল ছাড়ে না। ক্রমশঃ অভ্যাস হয়ে উঠেছে। জগনের ফেলে যাওয়া টাট বাট্ ছক গুটি নিয়ে আবার তারা ব্যবসা ফেঁদেছে। মেলায় মেলায় আসরও বসাচ্ছে। ক্রমশঃ তারাও রপ্ত হয়ে উঠেছে রীতিমত।

কাঁচা পয়সার স্বাদ পেয়ে গদাই আজ কাল বদলে গেছে।

গদাই কামার নোতুন বাড়ী করেছে। নিবারণ এই ক'মাসেই বিয়ে করবার চেষ্টাও করছে। গুপীও তৈরী হচ্ছে।

গদাই পাঁচজনের সামনে ওস্তাদের কথা খুব ভক্তিযুক্ত হয়ে স্মরণ করে—ওস্তাদের কেরপায় চলেছে একরকম।

কিন্তু মনে মনে ভাবে অন্যরকম।

জগন গিয়ে যেন তার পথই মুক্ত করে দিয়ে গেছে। ফিরে আসুক এটা যেন সে চায় না। গল্প করে—জানতাম এমনিই হবে। হাবুডুবু খাওয়া ভাল নয়, শেষ মেষ দিলে কিনা বুড়িকেই খুন করে!

নিবারণ চুপ করে মাথা নাড়ে। গদাই বলে ওঠে বিজ্ঞের মত

—হবে না? বাপ্‌কো বেটা, ওর বাপও নাকি ওর মাকে—

কথাটা আর শোনা যায় না। ইসারায় বুঝিয়ে দেয়, গলা টিপে বাকী ব্যাপারটুকু।

এইসব জটলা রটনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য চলে গেছে কুমুদ। স্বামীর ভিটে; কোথাও আজ সেখানে সন্ধ্যাদীপ জ্বলে না মস্ত। বাড়ীর মাটির পাঁচীলগুলো ভাঙ্গতে সুরু হয়েছে। ঘরের মস্ত দোতলা কোঠা—সিমেণ্ট বাঁধানো রক, কয়েকটা গাছ-গাছালি সব অনাদৃতের মত পড়ে আছে। মনে হয় যেন ভূতের রাজ্য। এ বিষয় সম্পত্তি পুকুর বাগান সব যেন লুট হয়ে যাবে।

একজন চুপ করে দেখে যায় মাত্র, শোনেও সব আগুন জ্বালা মন্তব্য সে পুষ্প। ডুবি বোষ্টমীও হাল ছেড়ে দিয়েছে। শত বুঝিয়েও মেয়েকে পথে আনতে পারেনি। এই বয়সেই বদলে গেছে পুষ্প।

ডুবি বলে ওঠে—নির্ঘাৎ ক্ষেপে যাবি তুই এইবার পুষ্প।

পুষ্প হাসে—সেই গা জ্বালা করা হাসি।

—বাকী আছি নাকিগো ক্ষেপতে।

ডুবি মেয়েকে এখনও ঘরবাসী করবার চেষ্টা করে। বলে ওঠে—

—সেদিন অঞ্চল গাঁয়ের গোঁসাই এসেছিল।

—আবার আসবে? পুষ্প প্রশ্ন করে।

ডুবি মেয়ের দিকে চেয়ে থাকে। পুষ্পের প্রশ্নে যেন একটা আশা খুঁজে পায়। হয়তো মন টলেছে মেয়ের। আবার ঘরবাসী হতে চায় কোন চিরন্তন নারীমন। ডুবির মনে খুশির আমেজ, মেয়ের খোঁজ নেওয়ার ধরণ দেখে আশাই হয় তার। বলে ওঠে—হ্যাঁ। এই ঝুলন পূর্ণিমায় আসবে। একটু গলা নামিয়ে ডুবি বলে চলেছে গোঁসাইএর মস্ত আশ্রম। বিষয় আশয়ও ঢের। আর বয়সও তেমন কিছু নয়। ঝুলনের সময় আসবে বলেছে।

পুষ্প হাসে, বলে ওঠে—ভালই হবে। নদীতে তখন ছুকানা বান। সেই অথৈ জলে ঝাঁপ দোব আমি ওই বুড়ো আসবার আগেই।

চমকে ওঠে ডুবি। দজ্জাল ওই মেয়েটাকে বাগে আনতে পারে না। দপ্ করে জ্বলে ওঠে—কি করবো তোকে নিয়ে বলতে পারিস পোড়ার মুখী?

পুষ্প জবাব দেয় শান্ত কণ্ঠে।—আমার পথ আমিই দেখবো। মাথা তুমি আর খারাপ করো না।

গুণ গুণ করে সুর তুলে মাধুকরীতে বের হয়ে গেল পুষ্প। ডুবি ওর হাব ভাব দেখে ভয় পেয়ে গেছে। গড়ানো পাথর ঘাটে ঘাটে ঠেক খেয়ে বেড়ায়, ওর গায়ে শেওলা জমে না। হঠাৎ সেই সচল যৌবন তরী কোন দয়ে মজে গেছে, কে জানে অতলে তলিয়ে যাবে কিনা? ভালোবাসার নেশা—সর্বনেশে জিনিষ। আগুনের চেয়ে বেশী জ্বালা সেই গরল কিনা তারই মেয়ের গায়ে ছিটিয়ে পড়েছে!

রাঙ্গাবাবু লাঠি ঠুকতে ঠুকতে আসে। ছানির জন্য ইদানিং চোখে প্রায় দেখতেই পায় না। তবু বহুদিনের অভ্যস্ত পথে একবার না এসে থাকতে পারে না।

ডুবি গজগজ করে—এইবার খানা খন্দে পড়ে অপঘাতে মরবে কোনদিন। কানা হয়েছো চোখ কান গেছে তবু আসা চাই?

এত কালেব রাঙ্গাবাবুর মুখে কেমন একটা অসহায় বেদনা পঙ্গু লোকটা আজ সব হারিয়ে এই ক্ষণিক আনন্দ টুকুকেই বড় করে দেখেছে। ওর কথায় হাসে রাঙ্গাবাবু, বলে—এত কালের পথ, পা ছুটো আপনা থেকেই চলে আসে এই দিক পানে। তাকে আটকাই কি করে বল?

ডুবি অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ওর দিকে। কোথায় যেন পুষ্পের কথার সঙ্গে ওর কথার মিল রয়েছে। একটা অদৃশ্য নেশার ঘোরে মত্ত হয়ে চলেছে পৃথিবী—এখানের সব মানুষই। তার জন্য জ্বলে, দুঃখ পায়। তবু সেই ভালো লাগার, ভালবাসার নেশা কাটানো তার দায়।

বৃদ্ধ রাঙ্গাবাবু সব হারিয়েও এইটুকু স্মৃতিকে হারাতে চায় না। দিনান্তে একবারও আসে ছানিপড়া চোখে জীবনের রঙ্গীন অতীত অধ্যায়টাকে দেখতে কি এক ব্যাকুলতা নিয়ে।

তাই কি যেন নেশার টানে, পথে পথেই ঘোরে পুষ্প।

বার বার খোঁজ করেছে পথের আনন্দে যারা বিভোর সেই রাত্রের মেলায় দেখা বাউলদের, কিন্তু অনেক খুঁজেও পুষ্প তাদের সন্ধান করতে পারে নি।

দেখা সে পায় নি। বীরচন্দ্রপুর অনেক দূর। কেমন যেন হারিয়ে যায় সে। অতদূরে যাবার ক্ষমতা তার নেই।

হঠাৎ সেদিন ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পড়েছে সে কুমুদদের গ্রামে।

—তুমি! কুমুদ চিনতে পারে।

রোদে তেতেপুড়ে তামাটে ময়লা হয়ে গেছে আগেকার সেই সোণা রং। মাথার চুলগুলো ন্যাড়া; কুমুদ সাদর আহ্বান জানায় তাকে।

—বসো।

দাওয়াতেই বসতে দিল তাকে। পুষ্প অবাক হয়ে ছেলেটির দিকে চেয়ে থাকে। হামাগুড়ি টানছে, বলিষ্ঠ গড়ন; মাঝে মাঝে দাঁড়াবার চেষ্টা করে ত্থ'একপা গিয়ে থপ্ করে পড়ে যায়। কাঁদে—নিজেই কান্না থামিয়ে আবার দাঁড়াবার চেষ্টা করে।

ছেলেটাকে দেখে কেমন যেন চমকে ওঠে পুষ্প। ওর কচি ডাগর ত্থ'চোখের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে একটি অতি পরিচিত চোখের চাইনি। কেমন যেন সব ডুবিয়ে দেয়।

নিজের দুর্বলতায় নিজের কাছেই লজ্জিত হয় পুষ্প। সামলে নিয়ে ওকে আদর করে কাছে টেনে নেয়, বুকে জড়িয়ে ধরে খোকাকে।

—ওমা, এযে দস্যি ছেলে গো, হবে না? বাপ কেমন!

চমকে ওঠে কুমুদ। দস্যি আরও অনেক বদনাম জগনের, কিন্তু তার ছেলেকে সেই পরিচয়গুলো। কেমন যেন বেদনায় মলিন হয়ে ওঠে

ওর মুখ। পুষ্পও বুঝতে পেরে সামলে নেয় কথাটা—বাঃ, বেঁচে থাক কোল জুড়ে।

কুমুদের তবু সেই ভিটেটার জন্য মন কেমন করে। কটা দিন সেখানে কি এক স্বপ্নে কেটেছিল। যৌবনের প্রথম আশার মুকুল ধরেছিল সেইখানে।

মালতীর খোঁজ নেয়, খোঁজ নেয় আরও কত জনের। আজ তাদেরই কথা কুমুদের বারবার মনে পড়ে। অকারণেই চোখ ছলছল হয়ে আসে তার। তবু বলে ওঠে যেন জোর করেই—ওখানে আর যাব না ভাবছি, গিয়ে কিইবা হবে।

বারবার ভেবেছে কুমুদ ও কথা। ভিটে পুরী হয়ে গেছে বাড়ী। তা ছাড়া ছেলেটাকে মানুষ করতে হবে। ওখানে ওর পরিচয় হবে খুনে জুয়াড়ীর ছেলে। এখানে তবু অন্য পরিবেশে অন্য পরিচয়ে বাঁচবে।

পুষ্প চুপ করে চেয়ে থাকে কুমুদেব দিকে। কুমুদ অনেক ভেবে-চিন্তেই বলে—তাই ঠিক কবলাম, আব নাইবা গেলাম।

তবু পুষ্প যেন ওব কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারে না। জগনকে আবার তেমনি ঘৃণা অবহেলা দিয়ে দূরে ফেলে রাখবে কুমুদ, এটা যেন ঠিক সহ্য করতে পারে না সে। তাই প্রশ্ন করে—সে ফিরে এলে যাবি না বৌ ?

পুষ্পের কথায় মুখ তুলে চাইল কুমুদ। একটি পরম বেদনাদায়ক ব্যর্থ অনুভূতি। জগন তার জীবনের গ্রহ, এই কথাটা আজ মা-ভাই বৌদিরা সবাই তাকে বেশ ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছে। কুমুদও কথাটা বারবার ভেবেছে। একই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁচেছে সে। তাই তার সঙ্গে সে আর সমন্ধ রাখবে না ঠিক করেছে।

কুমুদ মাথা নাড়ে পুষ্পের কথায়—তাকে বশ করা যায় না, সে বেবশ। ওদের রক্তে সেই অভিশাপই আছে। আর জ্বলে পুড়ে মরতে চাই না আমি।

কথাটা চুপ করে শোনে পুষ্প। একটা লোকের জন্য বেদনায়

মন ভরে ওঠে। আজ মনে হয় তার নিজের জন্যই এই সর্বনাশ। তারই রূপের আগুনে পুড়ে গেছে ওদের সংসার, মনের সব শ্রী ও প্রীতিটুকু পর্য্যন্ত। এ যেন কি এক খেলার ছলে পরম সর্বনাশ করে বসেছে। পুষ্প আর ভাবতে পারে না, উঠে পড়ে।

—বসবে না ?

জবাব দিল না পুষ্প। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ, তারই মধ্যে সে পথে নামল। তামাটে রোদ হাজারো লেলিহান শিখায় নেচে চলেছে মহাশূন্যে লকলকে শিখা মেলে। তেমনি আগুনের ঝলকে জ্বলছে একটি একক নিঃস্ব মন। জীবন তার জন্য শুধু ব্যর্থতাই এনেছে।

নদী পার হয়ে এগিয়ে চলে পুষ্প গ্রামের দিকে। পায়ে পায়ে জড়িয়ে আছে একটা অদৃশ্য বাঁধন, কাটতে গিয়েও পারে না। তাই জ্বলছে, তবু এ ঠাঁই ছেড়ে যেতে পারে না। পাঁচগাঁয়েই রয়ে গেছে কার প্রতীক্ষায়।

স্তব্ধ নির্জন গাছ-গাছালি ঘেরা বাড়ীখানা একটা পড়ো জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। উঠানের পায়ে চলা পথটুকু ঢেকে গেছে ঘাসে পাতায়, চারিদিকে মাথা তুলেছে লকলকে কালকাসিন্দে আসশেওড়ার ঘন জঙ্গল। তারই মাঝে বৃদ্ধ প্রহরীর মত বাড়ীখানা দাঁড়িয়ে আছে; ছাউনির অভাবে চালের ফাঁক দিয়ে জল পড়ছে, মাটির দেয়াল গলে গলে খসে পড়েছে। সেই হুমড়ি খাওয়া ঘরগুলোতে একরাশ চামচিকে বাসা বেঁধেছে—সেই সঙ্গে কয়েকটা বাদুড়ও।

ধ্বসে পড়া চোর কুঠরীর ফাঁকে খড় কুটোর মধ্যে বাসা বেঁধেছে কয়েকটা ভাম—কয়েক বছরের মধ্যে বেশ বংশ পরম্পরায় বাসস্থান গড়ে তুলেছে তারা। তাদের গায়ের বোটকা গন্ধে বসত বাড়ী আজ বন্য আদিম কোন রূপে পরিণত হয়েছে। কেউ ভয়ে যায় না ওদিকে। কতজন কত কথা বলে। গ্রামের মধ্যে জগনের ওই ধ্বংস পুরীটাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে কত কাহিনী, কত ভূত-প্রেতের গল্প। কারা

রাতের অন্ধকারে ছায়ারূপ ধরে ওই ভিটের চারিপাশে ঘুরে বেড়ায়। বাতাসে ওদের দীর্ঘশ্বাসের হাহাকার শব্দ।

রাতদুপুরে ওই ধ্বংসপুরীর মধ্য থেকে ভেসে আসে কাদের অতৃপ্ত কান্নার সুর আর আর্তনাদ। রাতের অন্ধকারে কে যেন মাঝে মাঝে চীৎকার করে ওঠে—ক্ষীণ অস্ফুঠ অন্তিম আর্তনাদ—ওরে মারিস না, মারিস না আমাকে। তবু তাকে হত্যা করে ছিল, রেহায় দেয়নি।

বাঁচেনি সে। বাঁচেনি জগনের মা, ঈশ্বরদাসের নিষ্ঠুর নৃশংস আক্রমণ থেকে। বাঁচেনি জগনেব মাসী—ওই মত্ত জানোয়ারের হিংস্রতার হাত থেকে। ওরা সবাই মরেছে, তবু কি যেন মায়ায় আজও ঘুরে ফেরে ওই ভিটের চারি পাশে। আজও তাদের অতৃপ্ত আত্মা ওর আকাশে বাতাশে কেঁদে ফেরে। বছরের পর বছর গেছে, তবু থামেনি সেই কান্না। পরিত্যক্ত হয়ে গেছে জগনের পিতৃভূমি।

বছরের পর বছর গ্রীষ্ম, বর্ষা আর শরতের মালা পরে আসে বছবটা। অজানতেই কয়েকটা বছর পার হয়ে গেছে, তার নিবিড় চিহ্ন ফুটে রয়েছে ওই ধ্বংসপুরীর বুকে। ক্রমশঃ বাড়ীখানা লুটিয়ে পড়ছে, ঘনতর হয়ে উঠেছে আগাছার জঙ্গল। উঠানের পেয়ারা গাছে ধরে আছে অজস্র পেয়ারা, তার চারিদিকে ছেয়ে আছে ঘন সবুজ পাতাগুলো। ছেলেব দল দূব থেকে চেয়ে থাকে ওই দিকে, সাহস নেই গাছে উঠে পাড়বার। একটা সাদা জাগ্রত আত্মা ওই বাড়ীর বাতাসে নিঃশ্বাস ফেলে ঘুরে বেড়ায়।

হঠাৎ সেদিন গোঁফ দাড়ির জঙ্গলে ঢাকা মুখ আর জ্বলজ্বলে দুটো চোখের চাহনি মেলে একটা লোক ওই বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়িয়েই চমকে ওঠে। হু হু কান্না আসে বুক ঠেলে। ঠিক চিনতে পারে না তার বাড়ীখানা, খুঁজে ফেরে হারানো সেই স্মৃতিটুকু। আবছা অন্ধকারে কোথায় যেন তার সব কিছু হারিয়ে গেছে এই ক'বছরেই। অজ্ঞাতেই তার দুচোখ বয়ে ঝরে পড়ে খানিকটা অশ্রু।

ধ্বসে পড়া বাড়ীখানায় ওর পায়ের শব্দে একটা আলোড়ন পড়ে

যায়—যেন কোন অবিবাহিত অতিথি এসে পড়েছে অতর্কিতে। ঝটপট করে উড়ে যায় কতকগুলো চামচিকে; চোর কুঠরী থেকে সশব্দে বের হয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে যায় এক জোড়া খটাস, আবছা অন্ধকারে ওদের শ্বাপদ লালসা মাখা চোখ দুটো ধক-ধক করে জ্বলছে। ঘাসে শুকনো ঝরাপাতার একটা খশ্ খশ শব্দ! কাঁপছে কালকাসিন্দের ডাল পাতা; কারা যেন ওর আবির্ভাবে চঞ্চল হয়ে উঠেছে এতদিন পর।

একটা মস্ত সনাতন সাপ বুকে হেঁটে চলে গেল ওই দিকে। এই হিংস্র পরিবেশে, ধ্বংস স্তূপের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে ধ্বংসদুতের মত একটি মানুষ। ছ'বছর আগের সেই জগনের আজকের অবস্থা আর এই ধ্বংসপুরীর আদিম দৃশ্যের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। সব আশা—ঘরের স্বপ্ন নিমিষে কোথায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। কত স্বপ্নই সে দেখেছিল—আবার কুমুদ গড়ে তুলবে সেই ঘর। আবার এসে নিজেকে ফিরে পাবে নোতুন করে, এই সপ্নই দেখেছিল সে।

গাছগাছালীর বুকে হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে তার ব্যর্থ কান্না গুমরে ওঠে। এই উতল অন্ধকারে কোথাও কোন আলো নেই, নেই এতটুকু আশা। যা ছিল তার, আজ সব নিঃশেষে হারিয়ে গেছে। এই তার পাপের সবচেয়ে কঠিন শাস্তি। দু'বছরের কারাবাসে দেহমনের উপর যে ঝড় আনতে পারেনি, তার চেয়ে কঠিন আঘাত হেনেছে তাঁকে এই নিরাশার ব্যথা।

একটু বাঁধানো চাতাল তখনও টিকে আছে। বেঁচে আছে একটা তুলসীগাছ। মনে পড়ে ওইখানে ধানের মরাইএর পাশে তুলসী তলায় কুমুদ প্রদীপ দিত গলবস্ত্র হয়ে, প্রণাম করতো সন্ধ্যাদেবতাকে। আজ সেখানে আলো নেই! ঈশ্বরদাসের ভিটে আজ শ্মশানের চেয়ে শূন্য; জগন সেই শশ্মানপুরীর একক প্রহরী। অন্তরে জ্বলছে শুধু চিতার আগুন।

তারা জ্বলছে দু একটা মিটমিট করে। আঁধারে গা ঢাকা

দিয়ে গ্রামে ঢুকেছিল জগন। তার পোড়ামুখ কাউকে দেখাতে চায় না সে।

পায়ে পায়ে ধ্বংসস্তূপ থেকে বের হয়ে এসে বাইরে দাঁড়াল সে। তারার আলোয় চকচক করছে ওর চোখ দুটো।

হঠাৎ কাকে দেখে থমকে দাঁড়ায় পুষ্প। ছায়ামূর্তির মত একটা মানুষ তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। চিনতে পারে। জগন ফিরেছে জেল থেকে। এ যেন অন্য মানুষ। তারার আলোয় দেখে ওর দু'চোখে ব্যর্থতার দুঃখ। আজ সব হারিয়ে কাঁদে ওই দুরন্ত দুর্বার মানুষটা। এ কান্না তার হারানো অতীতের জন্য। এর মাঝে পুষ্পের ঠাঁই নেই।

সেদিনের মিথ্যা মায়া কাটিয়েছে পুষ্প। যা দেখে সেদিন মেতে উঠেছিল, ওই লোকটা আজ সেই রূপের কাণাকড়িও অবশেষ রাখেনি। দেহের রূপ সেই আগুন জ্বালা নেশায় জ্বলে জ্বলে খাঁক হয়ে গেছে।

—কে ?

জগনের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে পুষ্প। দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল থেকে চকচক করছে দুচোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি। চমকে উঠেছে জগনও। কোথায় ধ্বংসপুরীর গাছ-গাছালির বুকে হুহু ঝড় উঠেছে, আর্তনাদ করে ওঠে একটা রাতজাগা পাখী। ধ্বংসপুরীর মাঝে দাঁড়িয়ে আজ প্রত্যক্ষ করে জগন, চারিদিকে সেই ভাঙ্গনই চলেছে দুর্বার গতিতে। পুষ্পও আজ সব হারিয়েছে।

যার জন্য একদিন মেতে উঠেছিল, আজ তারই চিতাভস্ম দেখছে সে।

পুষ্প হারিয়েছে তার রূপ, যৌবন আর সেই দৃষ্টি। তার জন্য জীবনের কোথাও কোন তৃপ্তির সন্ধান নেই।

—পুষ্প। চমকে ওঠে জগন।

পুষ্পও চেয়ে রয়েছে জগনের দিকে। জগনের চোখে আজ কোন

মোহ নেই, তা বেশ বুঝেছে সে। নিশ্চিন্ত হয়েছে মনে মনে। জগনকে ভালবাসতো যে পুষ্প, সে পুষ্প মরে গেছে।

জগনও যেন তাই দেখছে। ওর চোখে মৃত্যুর ছায়া।

পাঁচগাঁয়ের সবাই যেন মরে গেছে। মরে গেছে পাঁচগাঁয়ের যৌবন; ক'বছরে খর রৌদ্রতাপে তৃষিত শুষ্ক ধরিত্রী ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। কোথাও ওর বুকে কোন শ্যামসঞ্জীবতা, বাঁচবার আশ্বাস আজ অবশেষ নেই।

পুষ্পও যেন এই-ই চেয়েছিল, চেয়েছিল জগনকে এমনি করে আঘাত দিতে। সে আঘাত যেন ফিরে বাজে তার বুকে। নারীত্বের চরম পরাজয়ে কাঁদে পুষ্প অতল নিরন্ধ্র ওই অন্ধকারে। জগন পথে বের হয়ে গেল, ওর চোখে কোন কৌতূহল—কামনার স্বপ্ন নেই। পুষ্পকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল সে। অন্ধকারে পড়ে রইলো সে একা।

এই পুষ্পকে আজ কোন কাজে লাগবে না তার। যে যৌবন তার মনে আগুন ধরিয়েছিল, সেই ক্ষণিক উন্মাদনা আজ তার মনে এনেছে বয়সের অবসাদ। আজ বেঁচে থাকবার জন্য তার চাই অন্য পাথেয়। কামনা নয়; প্রেম প্রীতি আর স্নেহের একটু স্পর্শ—একটু আশ্রয়।

পাঁচগাঁয়ের বিস্তীর্ণ বুকে তার জন্য সেই সঞ্চয় কোথাও এতটুকু নেই।

—এই রাতের বেলা কোথায় যাবে? বেদনাভরা কণ্ঠে পিছু ডাকে পুষ্প।

পুষ্পের কথার জবাব দেয়নি জগন, একবার ফিরে দাঁড়িয়েছিল মাত্র। পুষ্প আজ তাকে বাঁধতে পারে না।

জগন আবার চলতে থাকে, হারিয়ে গেল পথের বাঁকে—রাতের অন্ধকারে ওই মানুষটি। ও যেন অন্য কোন জগন।

হাজারো পুষ্পের কান্না আর প্রীতি তাকে তৃপ্ত করতে পারে না।

পারে না সেই শান্তিনীড়ের সন্ধান দিতে। ওরা শুধু আগুন জ্বালতেই পারে। কামনার ব্যর্থতার আগুন তা কেবল অন্তর বাহিরকে ব্যর্থতার জ্বালায় পুড়িয়ে ছাই করে দেয়।

কুমুদ সকালে উঠে কাজ কর্ম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আগেকার সেই আদর আপ্যায়ন আজ ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

সংসারের রূপ বদলে গেছে। আজ সে আর তার ছেলেও এঁদের বোঝা হয়ে উঠেছে। তবু বাবা যে কদিন বেঁচেছিল সেই অবহেলাটা বুঝতে পারেনি। আজ ক্রমশঃ অনুভব করে তার ব্যর্থ হতাশভরা ভবিষ্যৎ। সব কিছু থেকেও কিছু নেই তার। কান্না আসে, কাঁদে সঙ্গোপনে।

বাবা মারা যাবার পর থেকে বাড়ীতে দেখা দিচ্ছে তার প্রতি একটা অবজ্ঞা, ক্ষীণ অবহেলার সুরটা প্রকট হয়ে ওঠে ক্রমশঃ। বৌদি শোনাতে ছাড়ে না, ক্রমশঃ তার জিভ দিয়ে গরল ছড়াচ্ছে। কঠিন কণ্ঠে হুকুম করে বৌদি—গোয়ালেরগরু-বাছুরগুলোও তো বের করে দিতে পারিস কুমুদ। সারাদিন ছেলের পেছনেই কাটে, কে জানে বাবা আমাদেরও তো মা ষষ্টির কাঁটা দু'একটা আছে। আমরা তো পারি না।

কুমুদও সেই থেকে গোয়ালের গরু বাছুর ছেড়ে দেওয়া, ছড়া ঝাঁট, সংসারের রান্না-বান্নাতেও হাত লাগিয়েছে। মা মাঝে মাঝে বলে—তোর জন্য বুক ফাটে বাছা। দেখে শুনে দিলাম, তা আমার যেমন কপাল। তোর বাবা গিয়ে বেঁচেছে। এই যন্ত্রণা তো দেখতে আসছে না সে।

চোখের জল গোপনে মুছে ওদের সামনে হাসে কুমুদ—না মা, বেশ তো আছি। সংসারের কাজ কি করতে নেই? নিজের বাড়ীতেও তো করতাম। বসে থাকা কি যায় পাঁচজনের সংসারে।

নিজের অতীতের সাজানো সংসারের কথা মনে পড়ে। গোয়াল

ভরা গরু, ধানের মরাই, পুকুর, বাগান, এতবড় বাড়ী সব কিছু তার ছিল। কিন্তু সব হারিয়ে গেছে আজ। নিজের দোষে নিজের ভুলে চরম সর্বনাশ করেছে সে। আজ সব কিছু থেকেওত বঞ্চিত তার থেকে।

মাকে কথার জবাব দিতে যেন কান্না আসে। কথাটা বলে সে বুকচিরে উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চাপবার চেষ্টা করে। কি নেই তার! সব থেকেও না থাকা। জগনকে আজ নোতুন করে পেতে চায়। দুঃখের মধ্য দিয়ে সে পাওয়া।

দুঃখ হয় ছেলেটার জন্য। বলিষ্ঠ, সুন্দর ছেলেটা তাকেও মনের মত একটা পোষাক কিনে দিতে পারে না। চোরের মত ঘুরে বেড়ায় সে। যেন কি এক অপরাধের বোঝা বইছে সে।

কুমুদ মাঝে মাঝে ভাবে পাঁচগাঁয়েই ফিরে যাবে তারা। জমি জারাত পুকুর তো আছে, বসত বাড়ীটাকে মেরামত করে নিয়ে মায়ে পোয়ে থাকবে সেখানে, যেমন করে হোক দিন চলে যাবে সুখে দুঃখে। ছেলেকে সেই স্বপ্নের গল্প শোনায়। পাঁচগাঁয়ের জন্য বোধহয় মন কাঁদে এবার কুমুদেরও। তাই মনে পড়ে নানা কথা—মাসী আছে তোর—মালতী মাসী। কত ভালবাসবে তোকে।

ক্লান্ত দুপুর। কাজকর্মের ফাঁকে এইটুকু অবসর। তাই ছেলেকে নিয়ে এই সময় দুদণ্ড কথা বলে কুমুদ। বাতাসে ভেসে আসে দূর থেকে ফুলের সৌরভ, কোথায় পাখী ডাকা মধ্যাহ্নে হারানো স্মৃতিকে খুঁজে পায় কুমুদ। পাঁচগাঁয়ের কথা মনে পড়ে।

ছেলেটা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। তাদেরও যে আলাদা কোন সত্তা আছে তা যেন বিশ্বাস করতেও ভাল লাগে। তাদেরও বাড়ী ঘর, বাবা সব আছে।

—আমাদের বাড়ী যাবো না? হ্যাঁ মা, বাবা কেন আসে না?

—যাবো বাবা। কুমুদ ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে। হু হু কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, নিজেকে হালকা করবার একটা পথ খুঁজে পায়।

হঠাৎ বৌদির খ্যানখ্যানে গলার সুরে চমকে ওঠে—তাই বলি

ঠাকুরঝি কোথায়? এদিকে যে দামড়া ছেলেকে কোলে বসিয়ে আদুর করছ তা জানবো কেমন করে। ছেলেকে মাথায় তুলছো বলে রাখলাম।

ওর গলায় চমকে ওঠে কুমুদ। দুপুরের রোদ ম্লান হয়ে আসছে, রাজ্যের ঝাঁটপাট বাকী, জল আনতে হবে, যেন সব ভুলে গিয়েছিল সে।

খোকনও ভয়ে শিউরে উঠে মাকে জড়িয়ে ধরে। বাড়ীর মধ্যে একমাত্র হাড় জিলজিলে বৌটাকেই বেশী ভয় করে সে। ফাঁক পেলেই ছুঁতোয় নাতায় পিটোয়।

—আমরা কবে যাবো মা।

—যাবো বাবা। শীগ্‌গীর যাবো। অসহ্য হয়ে উঠেছে ওদের এখানের জীবন। খোকনকে বসিয়ে রেখে বের হয়ে গেল কুমুদ। আবার কাজে মন দেয়।

খোকনও যেন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সকলেরই বাবা আসে, কত আদর করে। মাকে বাবার কথা জিজ্ঞাসা করেও কোন সদুত্তর পায়নি। ওই হাড় ডিগ্‌ডিগে শাকচুন্নীর মত মেয়েটা মাঝে মাঝে কি যেন বলে তার বাবার সম্বন্ধে। মা চুপ করে কেবল কাঁদে।

বাবা! খোকনের মনে বাবার সম্বন্ধে একটি কৌতুহল রয়ে যায়। কি যেন একটা স্বপ্ন—বাবা আসবে, তাদের সব কষ্ট দূর হবে। মায়ের চোখের জলও পড়বে না আর। চলে যাবে তারা এখান থেকে তাদের বাড়ীতে।

হঠাৎ এমনি একদিনে ওকে আসতে দেখে অবাক হয়ে যায় খোকন। রাস্তার ধারে খেলছিল ছেলেদের সঙ্গে; ছোট মামাও ছিল সেখানে। লোকটাকে দেখে ছোট মামা এগিয়ে যায়; খোকন ভীত চাহনীতে চেয়ে থাকে ওর দিকে। কেমন দাঁড়ি-গোঁফ ঢাকা মুখ; তবু চোখের চাহনীতে এমন একটা কিছু আছে যা এতদিন এ বাড়ীতে কারোও চোখে দেখেনি। ওই চোখে কি একটা মধুর স্পর্শের আহ্বান।

শেষ পর্য্যন্ত এইখানে আসে জগন। পাঁচগাঁয়ের শূণ্য সেই ঘর, ধ্বংসপুরী, পুষ্পের সারা দেহ মনের নিদারুণ রিক্ততার হাহাকার তার মনের শূণ্যতাকে প্রকট করে তোলে। সেই নিদারুণ রুক্ষ কঠিন মরুভূমির রুক্ষতা তার সারা মনে আনে নিদারুণ ব্যর্থতার তৃষ্ণা। কোথাও তার জন্য কোন পাণীয়ের সন্ধান নেই। মরিচীকার পিছনে অযথা ছুটে একদিন যেন সেই পরম তৃষ্ণা বুকে নিয়েই লুটিয়ে পড়বে পথের মধ্যে। কোথাও ঠাঁই নেই তার। তাই পথে বের হয়ে পড়েছে পাঁচগা ছেড়ে।

বিশাল এই বিশ্বের মাঝে তার জন্য কোন তৃপ্তির সঞ্চয় নেই। আশ্রয় নেই কোন। এমনি সব হারানোর দিনে পায়ে পায়ে এখানে পৌঁছেছে জগন মনের কোনে পরম একটু আশা নিয়ে।

হঠাৎ জগন থমকে দাঁড়িয়েছে খোকনকে দেখে। কচি কিশোরকে বুকে জড়িয়ে ধরে অনুভব করে সারা শরীরে ওর হিম-শীতল স্পর্শ।

—বাবা!

জগন কথা কইবার শক্তিটুকুও যেন হারিয়ে ফেলে। যে শূন্যতা পূর্ণ করতে পারেনি পুষ্প, কুমুদ, যে শূন্যতা ছিল তার বুক জুড়ে, আজ তা যেন পূর্ণ হয়।

নোতুন করে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখে জগন। শান্তির নীড় বাঁধবে সে, নোতুন করে আবার বাঁচবে জগন। বাঁচবার সাধনা করবে।

খোকন অবাক হয়ে গেছে।

সে জানে না জগনের মনে এক হয়ে মিশে গেছে এত দিনের ব্যর্থতা, কত আলো জ্বলা রাত্রির উন্মাদনা, পুষ্পের যৌবন মদির দেহের লাস্য।

সব কামনার জ্বালার পরিসমাপ্তি ঘটেছে একটি অখণ্ড শান্তির নিবিড় স্তব্ধতায়। আজ জীবনের মানে খুঁজে পায় সে। রূপ আর রং নিয়ে খেলার পরিসমাপ্তি ঘটুক।

জগন আজ এখানে এসে ওর স্পর্শে সেই পথের নিশানা পেয়েছে, ওর চোখের আলোয় খুঁজে পায় তার হারানো জীবনকে।

কুমুদ কায করছিল। হঠাৎ বাড়ীর বাইরে একটা ডাক শুনে চমকে ওঠে। কাঁপছে সারা দেহ অসহ্য উত্তেজনায়। তার সব দুঃখ যেন শেষ হয়ে আসছে।

খবর পেয়ে কুমুদ বাইরের বাড়ীতে ছুটে এসেছে। হঠাৎ কাছে এসে থমকে দাঁড়াল সে, খোকনকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে দুর্বার মানুষটা। ছোট্ট দুটো হাত দিয়ে তাকে বেঁধে ফেলেছে খোকন ওই বেপরোয়া মানুষটাকে কি নিবিড় বাঁধনে।

এতদিন এত চেষ্টা করেও কুমুদ যাকে বাঁধতে পারে নি, খোকন তাকে জয় করেছে নিঃশেষে।

বলে ওঠে খোকন—বাড়ী যাবো না বাবা?

জগন সহজ কণ্ঠে জবাব দেয়—যাবে বৈকি। নিতেই তো এলাম।

কুমুদ এগিয়ে আসে। জগন চেয়ে থাকে ওর দিকে। এ কুমুদকে আজ নোতুন করে চেনে জগন।

আবার নোতুন করে ঘর বেঁধেছে জগন পাঁচগায়ে এসে। আবার ধ্বসেপড়া বাড়ীটাকে খাড়া করেছে, আগাছার জঙ্গল দূর হয়ে গেছে কোনদিকে। রাতের অন্ধকারে সেখানে আর সরীসৃপরা ঘুরে বেড়ায় না, নামে না অতল অন্ধকার। সে ঘরে আজ প্রদীপ জ্বলে, জ্বলে সন্ধ্যাদীপ কি শান্তির স্বপ্ন নিয়ে। ধ্বংস স্তূপের রূপ বদলে ফেলে তার উপর নোতুন ঘর বেঁধেছে। জমিজারাত চাষ-বাস নিয়েই থাকবে সে। তাতেই কোনমতে যেমন করে হোক দিন চলে যাবে তার। বাকী সময় টুকু কাটবে ঘরের কোনে ওদের ঘিরে।

গদাই কামার জুয়ার দল গড়েছে—গড়ুক, ওই সর্বনাশা রং-এর খেলায় আর নেই জগন। জুয়ার রংএ আর মোহ নেই তার।

কুমুদ চেয়ে থাকে লোকটার দিকে। সন্ধ্যার ম্লান প্রদীপের আলোয় গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করে সে গৃহদেবতাকে। শান্তি দাও, স্বস্তি দাও ঠাকুর। সর্বনাশা নেশা থেকে ওকে নিস্কৃতি দাও।

হ্যারিকেনের ম্লান আলোয় খোকন পড়ছে, ওপাশে বসে আছে

একটা নই বাছুর। জগন অবাক হয়ে দেখছে, ছোট্ট ঘর তার পূর্ণ হয়ে উঠেছে। আবার বাঁচবার পথ দেখছে সে।

এমনি তারা জ্বালা ম্লান আলোয় মলিন বিবর্ণ একটি মেয়ে বীরচন্দ্রপুরের আখড়ায় এসে হাজির হয়েছে। ছায়ান্ধকার জায়গাটার চারি দিকে নেমেছে সুরের ধারা। একতারার করুণ উদাস সুর রাতের অন্ধকার ভরিয়ে তোলে। পুষ্প আজ ঘর ছেড়ে বের হয়েছে পথে, কি এক পরম আনন্দের সন্ধানে, রূপাতীত সেই আনন্দের আভাষ তার সুরে সুরে।

কি রূপ দেখলাম রে
আমার মাঝত বাহির হইয়া
দেখা দিলেক আমারে।

নিজেকে এখনও চিনতে পারেনি পুষ্প।

আজও কাঁদে রাত্রি নিশিথে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকে জোনাক জ্বলে—বাতাস কাঁপে গাছের মাথায়, শূণ্য প্রান্তরে। আকাশে আকাশে সেই তারাকিণী রাত্রির নিথর কান্না। পুষ্পের অফুরান কান্নার সুরও সেই ঐক্যতানে মিশে গেছে—হারিয়ে গেছে।